SHEFALI

Gargi Bhattacharya

COPYRIGHTED

MATERIAL

শেফালি

গার্গী ভট্টাচার্য

স্বর্গীয় ফাদার ব্যারিকে ,

আমার জীবনে যাঁর অবদান

ভোরের শেফালির মতন ফ্রেস ;

If you tell the truth you don't have to remember anything.

- **Notebook entry, January or February 1894, *Mark Twain's Notebook*, ed. Albert Bigelow Paine (1935)**

শেফালি

পরবাসে , তিনজন নারী একটি বাড়ি ভাড়া নিয়ে বসবাস করতো । ওরা সবাই রাতে পড়াশোনা - আর দিনে কাজ করতো । তিনজনই ,যৌবনের শিলায় বসে । রেশমী দেশে । নাম শেফালি , জলি আর মেহের ।

এদের মধ্যে সবচেয়ে বড় হল শেফালি । একটি হিন্দু দেশ থেকে এসেছে । নাম ফড়িং । তার বাবা অনেকদিন হল মারা গেছে । মা ওকে একা হাতে মানুষ করেছে । বিদেশে আসার আগে, এক চা কোম্পানিতে কাজ করতো । পরে উচ্চশিক্ষা নিতে, ফড়িং থেকে প্রবাসে আসে । বিয়েও হয়েছিলো প্রেম করে । কিন্তু স্বামীর সাথে বিচ্ছেদ ঘটে যায় ।

শেফালি একটু রোগাটে । তাই ওর স্বামীর ধারণা যে এরকম রোগা মেয়েদের সন্তান হওয়া সম্ভব নয় বলেই তার কোনো ছেলেপুলে নেই । এই নিয়েই বিবাদ ও পরে বিচ্ছেদ । শেফালি, চা-কোম্পানিতে হিসেবের কাজ

করতো । বি-কম অনার্স পাশ করে সে এম-কমও করেছিলো । তার স্বামী ছিলো এক আধুনিক ফার্মের সি-এ । সেও এম-কম পড়তো । সেখানেই আলাপ ।

পরে শেফালি বৃত্তি নিয়ে বিদেশে আসে । আসলে প্রেম হলেও, এটা একধরণের প্রয়োজনে বিয়ে । মানে কাউকে না পেয়ে একে বিয়ে করে শেফালি । ওর বাবার ঠিকানা কেউ জানেনা । মা, একা মেয়েকে বড় করেছে আর মেয়ে খুব রোগা । লোকে ওকে দুনিয়ার শেষ রোগা বলতো । তাই ওর প্রাক্তন স্বামী অজিত, ওকে প্রপোজ করতেই ও রাজি হয়ে গিয়েছিলো । অজিত অবশ্য বলতো যে শেফালি ওর থেকেও ভালো অ্যাকাউন্টেন্ট ।

শেফালির বাবা, রতন- আগে জাহাজে কাজ করতো । বহুদিন ধরেই সেখানে কর্মী হয়ে ছিলো । একদিন সেই বিনোদন তরী, সমুদ্রজলে ডুবে যায় । অনেক লোককে নিয়ে, একমাসের জন্য যাত্রা করে জাহাজটি । পথে ডুবে যায় ।

কেউ-ই জীবিত ছিলো না । একমাত্র শেফালির বাবা ছাড়া । তাকে বাঁচায় এক ডলফিন । সে তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে আসে , ডাঙার কাছে । পরে দুজন বন্ধু হয়ে যায় ।

কিন্তু শেফালির বাবার, এই ফিরে আসাকে ভালো চোখে দেখেনি মানুষ । সবাই মনে করেছে যে ভদ্রলোক নির্মম তাই অন্য সবাইকে ডুবন্ত জাহাজে ফেলে রেখে পালিয়ে এসেছে । এই কাপুরুষকে ; ফড়িং দেশের সমাজে কেউ গ্রহণ করতে আগ্রহী নয় ।

এমন সময় ওদের এলাকার এক ধনী, রাজনীতির মানুষের বডি ডবল হিসেবে যোগ দেবার আহ্বান জানায় শেফালির বাবাকে তার পারিষদেরা ।

ভদ্রলোক দেখলো যে সৎ পথে কিছু করা আর তার পক্ষে সম্ভব নয় । কারণ কেউ তাকে একটাও সুযোগ দেবেনা । তাই এই পার্টির লোকের সাথে হাত মেলালে আর কিছু না হোক্ বেঁচে বর্তে থাকবে পরিবার নিয়ে ।

যেমন ভাবা, তেমন কাজ । এককথায় রাজি হয়ে যাওয়া যাকে বলে আর কি ! এরপর থেকে রতনবাবু, একজন নামীদামী **ভিভিআইপি** সেজে লোকসমক্ষে বার হতো । নেতাজী তখন দেশ-ভ্রমণ , হাসপাতাল , সরাইখানা , সুরার আড্ডা ইত্যাদিতে ব্যস্ত থাকতেন । রতনের এই কাজের কথা জানতো কেবল ওর স্ত্রী । অন্যরা জানতো যে সে অন্য শহরে থাকে আর কাজ করে ।

মাঝে মাঝে আসে । জাহাজি বলে লোকে চট্ করে বিশ্বাস করে নিতো ।

নেতাজীর আদবকায়দা সবই রপ্ত করে ফেলা রতন, দেখতে ঐ ভদ্রলোকের মতনই ছিলো- ভাগ্যচক্রে ।

তাই তাকে গড়ে পিঠে নিতে অসুবিধে হয়নি ।

দলনেতা , তাকে অবশ্যই জানালেন যে তার জন্য লোক দেখানো সিকিউরিটি থাকবে । আসল কমান্ডোরা থাকবে না । বুলেট প্রুফ জ্যাকেট সে পাবেনা । আর তার খাবার চেখে দেখার কেউ থাকবে না । সে নিজেই রিস্ক্ নিয়ে খাবে । অর্থাৎ প্রক্সি দেবে কিন্তু অরিজিন্যালের কোনো সুবিধে পাবেনা । কারণ সে মরলে, অন্য বডি ডবল আসবে । সেটা পরিস্থিতির ওপরে যে নেতাজী আড়াল থেকে কাজ করবেন নাকি অল্পের জন্য বেঁচে গেছেন এই মর্মে আবার স্টেজে নামবেন । **রতন, দলনেতার রক্ষিতা আর স্ত্রীকে ইচ্ছে হলেও ভোগ করতে সক্ষম হবেনা । এক শয্যায় শুলেও ।**

রতনের কোনো সমস্যা ছিলো না এসবে । সে কামুক না । আর বাসায় তার সুন্দরী স্ত্রী আছে । একটি মেয়েও আছে যে স্কুলে যায় । কাজেই একদিকে সে ফ্যামিলি ম্যান । নেহাৎ-ই ভাগ্য দোষে এই কাজে নামতে হয়েছে ।

যখন ছুটি পেয়ে বাড়ি যায় তখন খুব ভালোলাগে । মেয়ের মিষ্টি হাসি আর স্ত্রীর মধুর কথাবার্তা উপরি

পওনা । তার স্ত্রী বোঝে আসল রতনকে । নিন্দা , ভীতু অপবাদ আর বডি ডবলের এই আজব কাজের বাইরের মানুষকে ।

মজায় ছিলো কিন্তু একদিন তাকে পালাতে হয় । কারণ ওকে আসল নেতা ভেবে, কিছু ক্রিমিন্যাল খুন করার প্ল্যান করে । তাই এই ছকের কথা জেনে রতন পালিয়ে যায় । প্রাণের ভয়ে । দ্বিতীয়বার আর ফড়িং দেশে ফেরেনা ।

বৌ মেয়ের কথাও ভুলতে হয় তাকে ।

সেই থেকে শেফালি একা ।

মেহেরের বাবা- রত্ন। নাম তারও রত্ন, তবে রতন নয় । তার নিবাস হিন্দু দেশে হলেও, শেষে তার তরী গিয়ে ভেড়ে এক অন্য দেশে । রক্ষণশীল দেশ । ধর্মভীরুদের

দেশ । নাম আল্‌ফাজা । তাকে কিছুটা কর্মের কারণেই যেতে হয় । সংসার ফাঁদে ওখানে গিয়েই ।

এই অপূর্ব দেশে, কারিগরি বিদ্যার চমৎকারের জন্য সবই সাজানো গোছানো । ছোট দেশ, একদিকে আধুনিক আবার অন্যদিকে রক্ষণশীল । মেয়েরা, মুখে ওড়না পরে ঘোরে । অনেকে- মাথায় সবসময় কাপড় পরে থাকে । এটাই ওদের সামাজিক রীতি । অপরূপা মেয়েরা খুবই কোমল । পুরুষেরাও সুন্দর । সুগঠিত । সুগ্রন্থিত সমাজ ব্যবস্থা । শান্তিময় ।

এটাই একমাত্র দেশ, যেখানে কোনো উগ্রবাদ নেই ।

হিন্দুদের পুজো , পালাপার্বণ হয় আর খ্রিস্টান মানুষের যিসাসের উৎসবও পালিত হয় । সবাই মিলেমিশে থাকে । এখানেই হিন্দু দুর্গাপুজোতে, এক অপরূপা, যার নাম অদা , তাকে ঢাকির কাজ করতে দেখে রত্ন । ওর পুরো নাম রত্নকমল । তার দিকে বিদ্যুৎ হেনে অদা বলে ওঠে , --এই যে নকল রত্ন, মানে জুয়েল তুমি ঢাক বাজাতে পারো ?

নাহ্! রত্ন পারেনা । কোনোদিন বাজায়ও নি ।

পরিবারের অভ্যাসে ছিলো না । কেউ বাজাতো না, তাই তাকেও শিখতে হয়নি ।

রত্ন মৃদু হেসে বলে :: নাহ্ ! ওসব আমার কম্মো নয় । আপনি বাজান । আর দারুণ বাজিয়েছেন তো !

সত্যি , অদা ঐ ঢাক বাজানো প্রতিযোগিতায় প্রথম প্রাইজ

পায় । পুজোর পরে ঢাকি উৎসব হয় । সেই বছর মহিলারাও অংশ গ্রহণ করে । আর জেতে ! নিপুন প্যান্ডেলের বাইরে বালির স্তুপ আর ভাস্কর্য । স্তুপগুলো প্রাকৃতিক আর ভাস্কর্য হল মানুষের তৈরি ।

এমনকি মা দুগ্গার মূর্তিটিও বালি দিয়ে বানানো । অপূর্ব তার গড়ণ আর রূপ ।

এখান থেকেই অদার সাথে মাখামাখি যা কিনা ঘনিষ্ঠতায় গিয়ে মেশে । অদার স্বামী এক ব্যবসাদার । সে কঙ্কালের ব্যবসা করে । চিকিৎসা বিদ্যার লোক- শিক্ষার জন্য , আর শিশুরা- খেলনা হিসেবে কেনে । আবার অনেক নামী মানুষের কবর থেকে, মৃতদেহ লোপাট হয়ে যায় । তাই আগে থেকেই , কবর টাটকা থাকতে থাকতেই তা খুঁড়ে লাশ বার করা হয় আর গুপ্ত স্থানে সমাধিস্থ করা হয় । নকল একটি কঙ্কাল নিয়ে, আগের কবরে রেখে দেওয়া হয় । এই কাজ হয় গোপনে । আর কঙ্কাল কেনে লোকেরা, ডাইরেক্ট অদার স্বামীর কাছ থেকে । ছোট্ট দেশ আল্‌ফাজাতে- এই আজব ব্যবসা একজনই করে আর তা

হল অদার পতিদেব । দুই সন্তানের মা, অদাকে দেখে বোঝার উপায় নেই যে ইতিমধ্যে তার বাচ্চা হয়ে গেছে । চমৎকার ফিগার আর তা মেন্টেনও করে চলেছে সমানে । ওর বর নাকি ওকে মোটা হলে ত্যাগ করবে । হয়ত মজা করেই বলে কিন্তু অদা তবুও নিজেকে ফিট্ রাখে । জিমে গিয়ে একগাদা ব্যায়াম, ওয়েট-ট্রেনিং না করলেও মোটামুটি হাঁটাচলার মধ্যে থাকে আর রোজ ঘন্টাখানেক হাঁটে । জোরে জোরে । স্বাস্থ্য ভালো থাকে আর মনও ফুরফুরে । ওর বর বাহবা দেয় । বলে ::এই তো আমার বৌ ! মোটা কঙ্কাল কেউ কখনো দেখেছে ?

এই অদার সাথে মাখামাখি হলে তার বাড়ি যাওয়া শুরু করে রত্নকমল । অর্থাৎ আরেক, শর্টে- রতন !

এই দেশে শুক্রবার সবার ছুটি থাকে । রবিবার লোকে অফিস কাছারিতে যায় । অদার বাচ্চা দুটি স্কুলে যায় । তখন সে ট্রেনে করে দূর দূরান্তে ঘুরে বেড়ায় । বিশেষ করে নানান ফকিরের সমাধিস্থলে । তবে রাতের আঁধারে, সে লুকিয়ে নাইট ক্লাবে যায় । সেখানে নানান বয়সী মানুষের সাথে মেলামেশা করে । বিশেষ করে ছেলেদের সাথে । যদিও লোকে ওকে দিদি বলে ডাকে । কঙ্কালের মাঝে তার বসবাস । বাড়ি ভর্তি স্কেলেটন্ । নানান আকারের , ছাড়নো ছিটানো । তারই মধ্যে

একাকিনী অদা হাঁপিয়ে ওঠে । আর রাতে- ঐ ভয়াল সমস্ত কঙ্কালের চোখের আড়াল হতেই, নাইট ক্লাবে- মানুষের মাঝে ভিড়ে যায় । জ্যান্ত লোক দেখলে মন ভালো হয় । দিনের বেলাও ফকিরের সান্নিধ্য নিতে যায় এই কারণেই । একা বাড়িতে ওর ভয় লাগে । এই এত্তোগুলো কঙ্কাল ! থরে থরে সাজানো । যদিও আলাদা ঘর ইত্যাদি আছে ওদের জন্য তবুও এসব প্রেতের কান্ডকারখানা সম্পর্কে কে জানে ? ওর স্বামী বলে যে এটা দিয়ে সে নিজের খরচ চালায় :: আই ডু ইট ফর মাই লিভিং । ইট্স্ নট সামথিং ফানি আই নো ! তবুও আমার রুটি আসে এখান থেকে ।

কাজেই অদার যতই মন্দ লাগুক সে মুখ বুজে সব সহ্য করে । হয়ত বাচ্চাদের কাউকে এই ব্যবসায় দেবে । তখন অদা প্রটেস্ট করবে । কারণ সে চায়না ওর সন্তানও এইসব আজব কাজ করুক ।

দেখা যাক্ কী হয় ! আগামীদিনের কথা, জানে কে আর ? ওদের দেবস্থানে মোম জ্বালিয়ে এই প্রার্থনা করে অদা সুন্দরী- যেন তার সন্তানেরা থাকে দুধে ভাতে । কঙ্কালের হাতে নয় ।

অদার সাথে, এই এক কারণেই ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ পায় রত্নকমল । কারণ সে লোকের মাঝে থাকেনা , থাকে কঙ্কালের মধ্যে ।তাই বুঝি একদিন মানুষ রত্নকে, নিজের সর্বস্ব দান করে অদা ।

গোলাপের পাপড়ির মতন ত্বক, আবীর লাল ঠোঁট আর ঘন, কালো কেশরাশি, অদাকে এক মুকুট বিহীন রাজকন্যা করে তুলেছে । যার মনে মেঘ জমেছে । অতীন্দ্রিয় এইসব লোকে, বাস করে করে ।

অদার সাথে ফিজিক্যাল হতে হতে রত্ন- একদিন আল্‌ফাজা সমাজের, ক্রুরলোচনে পড়ে যায় । লোকেরা ওদেরকে নিয়ে হাসি তামাশা শুরু করলে, খবর যায় অদার স্বামীর কানেও । কঙ্কালের ব্যবসায়ী এই মানুষটি যে খুব একটা ভাবুক আর ক্ষমাশীল হবে না তা তো বোঝাই যায় ।কাজেই আর্জি জানায় সে সমাজপতিদের কাছে । এই দেশে কেউ অন্যায় করলে, তাকে চরম শাস্তি দেওয়া হয় জনগণের সামনে । বিশাল ময়দানে একটা স্টেজ । তার চারদিকে লোক বসে । সেই স্টেজে শাস্তি প্রদান করা হয়, লোকচক্ষুর সম্মুখে । এরকমই নিয়ম ।

একজন বিবাহিতা রমণী কোন যুক্তিতে দিনের পর দিন পরপুরুষকে নিজের বিছানায় আনে ? আনতে পারে ?

তাই অদাকে সেই স্টেজে তুলে মুখটা কালো কাপড়ে ঢেকে , আদিম কালের মতন মুন্ডুচ্ছেদ করা হয় ।

সবার সামনে রক্তে ভেসে , লুটিয়ে পড়ে রূপসী রাজকন্যে অদা। রক্তকমলের সে এক স্বপ্নে দেখা , রূপবতী কন্যা । যার ভূষণ সোনা আর অলঙ্কার হীরা !

এমন কি তার সন্তান দুটিও, নিজের মায়ের এইরকম পাশবিক মৃত্যু দেখতে বাধ্য হয় । আসলে এই আল্‌ফাজা দেশে, এমন নিয়ম করার কারণ আছে । লোকে যখন নিজের চোখের সামনে শাস্তি দেখে , তখন অপরাধ করা থেকে অনেকাংশেই বিরত হয় । বুঝিবা তাকেও এইরকম পরিস্থিতিতে পড়তে হয় ,এইভেবে । কাজেই সবার সামনে মাথা কাটা যায় আক্ষরিক অর্থেই অথবা গলায় পরানো হয় ফাঁসির দড়ি ।

এই উন্নত দেশে , ভ্রূণ সংরক্ষণের ব্যাবস্থা আছে । তাই মৃত্যুর আগে , অদার গর্ভ থেকে ভ্রূণটি বার করে নিয়ে তাকে হাসপাতালের গোপন কুঠুরিতে রাখা হয় । এই দেশে , এই সমস্ত ক্ষেত্রে-পুরুষের কোনো শাস্তি হয়না । যাই করুক না কেন । কারণ সমাজ বলে যে পুরুষেরা বহিরজগতের জীব । আর তারা অত্যন্ত অ্যাগ্রেসিভ্ । তাই নারী, নিজেকে সংযত রাখলে বিপদে পড়বে না ।

ওদের শাস্তির প্যারামিটার হল- নারীর বাহ্যিক ব্যবহার । তবে খুন বা ডাকাতিতে অবশ্যই ছেলেরা শাস্তি পায় ।

গবেষণাগাড়ে বেড়ে ওঠে মেহের । মেহেরজান ।

যথাসময়ে জন্ম হয় এক অসামান্য সুন্দরী মেয়ের । ফুটফুটে এই কন্যাকে, তার মায়ের নিজ স্বামী গ্রহণ করে । দুটি তো আগেই ছিলো । ন্যানিদের হাতে ওকে তুলে দেওয়া হয়- তিন নম্বর হিসেবে । আর তার নিজের বাবা, রত্নকমল- একটুও কোমল হবার সুযোগ পায়না । কারণ তাকে হুমকি পেয়ে পালাতে হয় । সরকার বলে যে সে না পালালে তাকে গুম্ করা হবে । ফলে রত্নকমল, পালিয়ে যায় অত্যন্ত কঠোর হৃদয়ের পরিচয় দিয়েই ।

নিজের বাবা ও মাকে চোখে না দেখা মেহের , বেড়ে ওঠে সৎ ভাইবোন আর সৎ বাবার কাছেই ।

ওর বিয়ে হয়- কঙ্কাল নয় ; এক মানুষের সাথে যে অধ্যাপক । সেই মানুষটি, ওকে নিয়ে আসে প্রবাসে । মেহেরের প্রফেসর হবার ইচ্ছে ছিলো । সবাই কত সম্মান দেয় ওদের ! দেশ ভর্ত্তি সন্তান থাকে অধ্যাপকদের । একজন মানুষের, বেসিক্ চরিত্র গঠনের পেছনে তো ওরাই থাকে ।

নিয়মিত লেখাপড়া শুরু করে সে । কিন্তু ওর স্বামী তাতে বাধা দেয় ।

মেয়েরা সংসার করবে । এত পড়ে হবে কী ?

ওদের বন্ধু মহলেও লোকে বলতো যে ঘর সংসার দেখো । পড়াশোনা করছো ঠিক আছে কিন্তু বাইরে খেটে খাবার কোনো দরকার নেই । ওসব বাজে মেয়েরা করে । বাজারে বসে বিকিকিনির মতন- চাকরি বাকরি । আর লোকে তখন ওদের সম্মান দেয়না । তাই ভালো হবে যদি সে সংসার ধর্ম নিয়ে জীবন কাটায় ।

প্রথমদিকে মেহেরকে অনেক পরিশ্রম করতে হয়েছে । ওর স্বামী এক স্টেটে কাজ করতো আর ও অন্য স্টেটে পড়তো । সপ্তাহের শেষে ও স্বামীর কাছে যেতো । ঘর গুছিয়ে, রান্না করে দিয়ে আসতো । নিজের জন্য আর কিছু করা হতো না । সম্ভব হতনা, আসলে ক্লান্ত হয়ে যেতো । পরে বাচ্চা হলে ওর বর ওকে তার সাথে থাকতে বলে । ও গায়ে মাখেনা আর্জি ।ওর বন্ধুরা, মানসিক দিক থেকে খুব সাহায্য করে । স্বামীর সাথে দূরত্ব বাড়ে । এবং একসময় বিচ্ছেদ ।

সন্তানের দায়িত্ব মেহের নেয়নি । কারণ সে চালাতে পারবে না - পার্ট টাইম এক লেকচারের স্বল্প মাইনে দিয়ে । ডক্টরেট করলে ভালো রোজগার কিন্তু করার সময়

নেই তার । আর ধৈর্য্য । যখন পড়তে চেয়েছিলো তখনকার দিন থেকে বর্তমান অনেক আলাদা । বদলে গেছে সব । তাই সে ডক্টরেট করেনা আর শিশুকেও কাছে টেনে নেয়না । তার সবই এখন চলে কড়ির হিসেবে । প্রতিটা পাই পয়সার হিসেব করে চলে, টাইম ইজ মানি--- । নাহলে হয়ত অভুক্ত থেকে যাবে ।

এই যে বাড়িটায় থাকে এটাও অনেক ওল্ড । তবুও ভাড়া আকাশছোঁয়া ! অনেক সমস্যা এখানে । বৃষ্টিতে জল পড়ে , কিচেনে পাইপ দিয়ে ভালোমত গ্যাসে আসেনা । ওপরের রেঞ্জহুড্ চলেনা । ইত্যাদি । শীতকালে হিটার চলেনা । তবুও এর চেয়ে বেশি ভাড়া দিতে পারবে না বলেই সে এখানে আছে ।

এই বাসা, ওকে একটা জিনিসই দিয়েছে । তাহল দুটি অপূর্ব বন্ধু । ওর হাউজ মেটরা । চমৎকার দুটি মেয়ে ।

অন্য বন্ধুরা বলে সাইড বিজনেস শুরু করতে । সরকার তো অনেক লোন দেয়-- কিন্তু সেসব করতে গেলে নিজেকেই দৌড় ঝাঁপ করতে হবে । আর তখন এই কাজটাও ছেড়ে দিতে হবে । খাবে কী ?

নিজের বাচ্চা আর বরের কাছেও ফিরে গিয়ে লাভ নেই কারণ ওখানে তার দম বন্ধ হয়ে আসে ।

সবার সব আইডিয়া , মতামত মেনে নিতে নিতে ক্লান্ত সে । এখন একটুকু নীরবতা চায় । সেটাই কাম্য আর উপভোগ করে- তাই এই ব্যস্ত অথচ একার জীবনই কাটিয়ে চলেছে ।

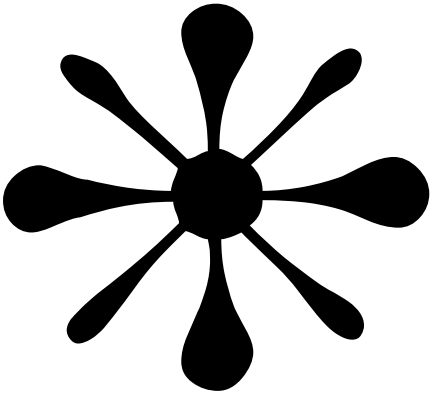

মেহেরের জীবনে অবশ্য স্বল্প সময়ের জন্য এক পুরুষ আসে । নাম তার এন্দ্রে । তার স্বপ্ন, ভালো বাজনদার হওয়া । একটি রক্ মিউজিক ব্যান্ডের সাথে সে জড়িত ছিলো । সেখানে লিড্ গীটারিস্ট্ হিসাবে কাজ করতো । ওদের সাথে ঘুরতো । সার্কাসের মতন তাঁবু খাটিয়ে খাটিয়ে, বিভিন্ন শহরে ও গ্রামে গিয়ে গিয়ে গীত পরিবেশন করতো । ওদের দলের নাম ছিলো ক্যান্ডেল । অনেক মেয়েরা ও ছেলেরা মিলে একসাথে থাকতো । ওদের ব্যান্ডের নিজস্ব ঘোড়া ছিলো । তাতে চড়ে গান করতো । সাজানো বাগানে । মেয়েরা ক্যাবারে নাচতো ওদের গানের সাথে সাথে । অ্যাডাল্ট নাচ , সার্কাস আর বিনোদন ছিলো ওদের বিষয় । ডার্ক কমেডি । ইরোটিক কমেডি । ওদেরই দলের মেয়েরা আর ছেলেরাই, এগুলো করতো । তারা সবাই যাযাবর । এদের বেশিরভাগই এসেছে অনাথালয় থেকে । তাদের কেউ নেই । অনেকে আবার ঘর ছেড়েছে পারিবারিক সমস্যার জন্য- খুব ছোটবেলায় । কেউ কেউ ঈষৎ বোহেমিয়ান, তাই এই যাযাবরের জীবন বেছে নিয়েছে । তবে সবাই একশো-ভাগ শিল্পী । যদিও কেউ সেলিব্রিটি নয় । এন্দ্রে বলে যে শিল্পী মানে একজন

শিল্পীই । তার সেলিব্রিটি হবার বিশেষ কোনো প্রয়োজন আছে বলে সে মনে করেনা । সেই মানুষ, আর্ট ও ডিজাইন জানে কিনা আর বোঝে কিনা সেটাই বেশি জরুরি ।

এন্দ্রের সাথী ক্যারল, ছিলো সিঙ্গার । এন্দ্রে ; প্রায়শই নানান জায়গায় তাঁবু গেড়ে বসার পরে, অনেক দর্শক মেয়েকে নিয়ে রাত কাটাতো । পরে ওরা মলেস্ট করার কেসে ওকে ফাঁসাতো । তখন ক্যারল- যার বুক ভেঙে গেলেও শক্ত মন ভাঙতো না সে এগিয়ে এসে এন্দ্রেকে রক্ষা করতো ,প্রতিবারই ।

ও নাকি একটা চাকু রাখতো সঙ্গে । অনেকক্ষেত্রেই সেই মেয়েকে ভয় দেখাতো যে আর বেশি শোরগোল তুললেই এই চাকু তোমার বুকে বসাবো !

ক্যারল জানাতো যে- একবার একটি এলাকা ছাড়লে আর সেখানে ফিরবে না অন্তত: বছর ছয়েক । আর কোনো কেস হলে তো কখনোই না । তাই সেই সময়টুকু ধরে, ব্যাপারটাকে আটকে রাখার চেষ্টা করতো । তাঁবুতে ফিরে প্রতিবার এন্দ্রেকে শাসাতো । কিন্তু এন্দ্রে ভোলার বান্দা নয় । সে এগুলো থেকে ইউফোরিয়া নিতে অভ্যস্ত । বলে :: আমার বোরিং জীবনে, এখান থেকেই আলো পাই । আর খ্যাম্‌টা নাচতে নেমে, ঘোমটা টানার কারণ দেখিনা । ওরা

নিজেরা এসে অফার করে সমস্ত কিছু । কাকে যে ওরা মলেস্ট করা বলে বুঝিনা বাপু । সব খুলে ঘোরাফেরা করে । আর পাছায় চিমটি দিলেই :: আমার ইজ্জৎ নিয়েছে করে চিল্লিয়ে ওঠে ।

ক্যারল মনে মনে বলতো যে তার প্রেজেন্স থেকে কিছুই পায়না এন্দ্রে , এমনই তার কপাল অথচ এন্দ্রের সে অফিসিয়াল গার্লফ্রেন্ড । ও নাকি ক্যারলকে ছাড়বে না । ক্যারল অন্য কারো দিকে গেলে ও নাকি তাকে খুন করবে ক্যারলেরই চাকুটা দিয়ে । একবার ক্যারল এন্দ্রের ওপরে বিরক্ত হয়ে --- তার লাম্পট্য দেখে দেখে , ওদেরই দলের এক কোরাস গায়ক , হেন্ড্রিক্সের সাথে মাখামাখি শুরু করে । একদিন বর্ষণ মন্দ্রিত আঁধারে , এন্দ্রে , হেন্ড্রিক্সের তাঁবুতে ঢুকে তাকে এমন উত্তম মধ্যম দেয়- যে ভয়ে সে সাইকোলজিস্টের শরণাপন্ন হয় । অন্ধকার দেখলেই নাকি হেন্ড্রিক্সের মনে হত যে সেখানে লুকিয়ে আছে এন্দ্রে । ওকে মারার জন্য ।

মেহেরজানের সাথে আলাপ হবার সময় ক্যারল ছিলো না । তার কিছুদিন আগেই সে পুলিশ প্রটেক্শান নিয়ে ভিন্ন হয়ে গেছে । এক মধ্য বয়সী উকিল ওকে বিয়ে করেছে । সুখে আছে । ছানাপোনাও নাকি হয়েছে ।

ঠিক তখনই মেহেরের সাথে আলাপ হয় এন্দ্রের । একটি গানের আসরে । আর দুজনে ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে ।

একটি ছেলেও হয় , মেহেরের । কিন্তু সে হয় এক স্টিল বর্ন বেবী । তবুও সবাইকে এন্দ্রে বলতো যে সে বাবা হয়েছিলো । তার পরিবার হয়েছিলো । সেও গুছাতে জানে । সেও সিন্সিয়ার হাজব্যান্ড ।

শিশুটি মারা যাবার একবছর পরই , এন্দ্রে একদিন হঠাৎ উধাও হয়ে যায় । না, তার গানের গ্রুপে তাকে খুঁজে পায় না মেহের । লোকাল পুলিশে জানিয়েও লাভ হয়না । আজও এন্দ্রে নিঁখোজ । পুলিশের খবর পেয়ে, ওর গানের দল- ক্যান্ডেল থেকে, হর্তাকর্তারা বেশ চার-পাঁচটি শহরে নানান ব্যাক্তিকে দেখতে যায় । কিন্তু কেউই এন্দ্রে নয় । কয়েকটি লাশও আইডেন্টিফাই করার জন্য ওদের ডাক আসে । কিন্তু কোনোটাই তাদের ব্রিলিয়্যান্ট গীটারিস্ট এন্দ্রের নয় । ছেঁড়া পোশাক পরে, পা নাচাতে নাচাতে টুংটাং করা- বাবা ও সংসারি এন্দ্রে ।

সে মানে এন্দ্রে ; আগে অনেকবার মেহেরকে বলেছে যে মিশরে নাকি এক গায়ক আছে, যার জীবন ও চেহারা পুরো এন্দ্রের সাথে মিলে গেছে । সবকিছু একদম এক । অবিশ্বাস্য হলেও এটা সত্যি । তার ছবিও দেখিয়েছে, মেহেরকে , এন্দ্রে । একটু বয়সটা বেশি আরকি ঐ

লোকটির । মেহেরের কেবল মনে হতে লাগলো যে এন্দ্রে হয়ত মিশরেই গেছে, তার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জানতে । কারণ সেই লোকটি, যার নাম- **মামাদালো পিহুরি পেন্টু**- তার জীবন যখন এন্দ্রের মতন ও সে তার চেয়ে বেশ কিছুটা বড়, তাই সামনের বেশ কয়েকটি বছর সম্পর্কে এন্দ্রে তার কাছ থেকে জানতে পারবে । যে মামাদালোর জীবনে কী কী ঘটেছে যা এবার এন্দ্রের জীবনে সম্ভবতঃ হবে । তবে মেহের নিশ্চিত নয় এই ব্যাপারে । এটা ওর মনে হয়েছে । তাই পুলিশ বা ক্যান্ডেল দলের কাউকে এই সম্বন্ধে কিছু বলেনি । আর পুলিশ শুনলে তাজ্জবও হতে পারে । কে জানে? প্রয়োজনে পরে বলবে ।

মেহেরের মায়ের সম্পর্কে শুনেছিলো , এন্দ্রে । বলে :: তোমাদের দেশের লোক এত পাশবিক ? শুধুমাত্র পরকিয়া করেছে বলে তার মাথা কাটা গেলো ? আর সঙ্গী পুরুষের কিছু হলনা ? আমার সাথে আছো তাই তুমি আমার জীবনের সঙ্গে একভাবে জড়িয়ে গেছো । মিশরের সেই ছায়ামানুষ হয়ত তোমারও কিছু অজানা যাত্রা সম্পর্কে বলতে পারে । দেখো কী বলে ! টাইম ট্র্যাভেল করে যে **পিহুরি পেন্টু**।

কথা এই পর্যন্ত হয়েছে । তারপর একদিন সে নিরুদ্দেশ হয় । মেহের সত্যি জানেনা যে এন্দ্রে মিশরেই গেছে কিনা । আর যদি যায়ও, তবুও অনেকদিন হয়ে গেছে সে ফেরেনি । কাজেই নিজের ফিউচার নিয়ে আর ভাবেনা । একাকীত্বই উপভোগ করছে । আর দুই বান্ধবীর সঙ্গ । ওরা তিনজন ঠিক তিন বোনের মতন । মিলেমিশে থাকে । কে বলে মেয়েরা একসাথে থাকলে কেবল ঝগড়া,খুনসুঁটি আর হিংসা করে ? ---ওদের দেখো !

আসলে এন্দ্রের ঘর ছাড়ার ব্যাপারটাও আজব । ওর পুরো পরিবার ছিলো । বাবা, মা , ভাইবোন সব্বাই ।

ও যেই গ্রামে থাকতো, সেখানে ওর বাবা হ্যান্ডিম্যানের কাজ করতো । **লোকের দরকারে, নানান কাজ ওদের কাছে গিয়ে গিয়ে করে দিয়ে আসতো । ইলেকট্রিক, প্লাম্বিং, ছোটমোট ঘর সারানো, বাগান গোছানো এইসব ।**

ওর মা ছিলো শিক্ষিকা । অঙ্ক পড়াতো । তাকে ওরা বলতো ::: ম্যাথেমেটিশিয়ান ।

ওর বাবা ও মা অর্থাৎ ওরা স্বামী - স্ত্রী মিলে একটি নতুন মডেলের ,ভালো কোম্পানির গাড়ি কেনে । তখন ওদের গ্রামে- ধনীরাও ঐ গাড়ি কেনেনি । ওর বাবা-মায়ের গাড়ি কেনা, শখ ছিলো । অনেক ধনী ওদের এই তৎপরতা দেখে, লজ্জায় বলতো যে আমাদের কাছে গাড়ি হল এক জায়গা থেকে অন্য আরেক জায়গায় যাবার মেশিন । আর বর্তমানে সেটা আছে- তাই আমরা নতুন এই মডেলে টাকা ঢালিনি ।

কিন্তু গ্রামবাসী জানতো এগুলো হল মিথ্যে । গাড়ি কেনাবেচা করা আর নতুন মডেলের শো করতে এই ধনীদের জুড়ি মেলা ভার । এন্দ্রের বাবা ও মায়ের কেনা

সেই গাড়িটি, একদিন দুর্ঘটনায় পড়ে এবং খুবই অল্প সময়ের মধ্যে । উল্টোদিক থেকে একটা বড় জীপ এসে ওকে ধাক্কা মেরে পাশের খাদে ফেলে দেয় । এই যন্ত্রণা সইতে না পেরে ওর মা হৃদরোগে মারা যায় । কারণ অনেক শখ করে , কষ্টে টাকা জমিয়ে, সাধের এই গাড়িটি কিনেছিলো । এগুলি হল ওদের মতন সাধারণ মানুষের কাছে- জীবনে একবারই পাওয়া । তাই ওর মা রুবিনা শোকে কাহিল হয়ে মারা গেলো । আর বাবাও কেমন যেন হয়ে গেলো । কারণ পরে তদন্তে বার হয় যে এক ধনীর আদরের দুলালী, এই কাণ্ড বাধিয়েছে । তাদের যেই মডেল নেই, তা কী করে এক হ্যান্ডিম্যানের কাছে থাকে ? ক্লাসের আর স্টেটাসের কী কোনই দাম নেই আর ? সব কি মরে গেছে ? অভিজাত মানুষের অর্থ দিয়েই তো সমাজ চলে । আর তারা একটু ফান্ করতে পারবে না ? দামী মোটরে চড়তে পারবে না ?

অলিখিত নিয়ম হল এই যে --এই গ্রামে যে কোনো নতুন জিনিস আসবে ধনীদের হাত ধরে । কোনো সাধারণের হাত ধরে নয় । কারণ তাহলে সেই বস্তুটি, অভিজাতরা কিনে আর উপভোগ করতে পারবে না কারণ ওর গায়ে ততক্ষণে **গ্রস** তাক্মা লেগে গেছে । যে গ্রস লোকেরাও এগুলো কিনতে পারে । তাই ধনীরা ---শত ইচ্ছে থাকলেও আর ওটা নিতে পারবে না ।

কাজেই মেয়েটি, এটা করে ওদের উচিৎ শিক্ষা দিয়েছে। ছোটলোক, ছোটলোক হয়েই থাক্ । ওপরদিকে হাত বাড়াতে গেলে, এমনই হবে প্রত্যেকের ।

মেয়েটির শাস্তি হলেও, মন ভেঙে যায় এন্দ্রের ।

কী ভীষণ নিষ্ঠুর ধনীরা ! এরপর তো এন্দ্রে চাইলেও এখানে কিছু করতে পারবে না । যদি ওদের মনে হয় যে এটা ওদেরও চাই তখনই বিবাদ হবে । আর ওদের কী চাই আর কী চাইনা তা স্বয়ং যীশুও হয়ত জানেন না । ওদের ; সমাজের ভালো ভালো জিনিসগুলো সব একাই খাবো আর মন্দ বস্তুগুলি নেবে অভাগারা এই অ্যাটিটিউড্ খুব নিন্দনীয় । কিন্তু উপায় কী ? তাই গাঁ ছাড়া হয় এন্দ্রে । ঠিক করে যে জীবনে কোথাও একটানা থাকবে না । যাযাবরই ভালো । অন্ততঃ সুখ না হলেও স্বস্তি আছে । কোনো বিশেষ ক্লাসের রোষে বা দোষে পড়তে হবেনা । বুড়ো হলে হয়ত পৈত্রিক ভিটেতে ফিরবে । ওর ভাই ওটার বর্তমান মালিক । বোনেরা নিজ নিজ গৃহে । আর ভাই অনেক সময়ই ওর ক্যান্ডেল দলের ফাংশানে আসে । ওদের গ্রামের দিকে তাঁবু ফেললে । ক্যাবারেও দেখে । ওর কাছ থেকে মদের এক্সট্রা বোতল নিয়ে যায় ওর ভাই । কাজেই সম্পর্ক আছে এবং ভালো ও মধুর । ভাইপো

ভাইঝিদের ; এন্দ্রে ভালোবাসে । ওদের জন্য গানও লিখেছে ।

মানুষের অনেক দু:খ । এই মেহের, এন্দ্রে সবার ।

মানুষ এক চক্রব্যূহের মধ্যে পড়ে আছে । কিন্তু কোনো অর্জুন আজও আসেনি তাদের রক্ষক হয়ে । অর্জুন মিথকথায় আছে , আছে পুরাণে । কিন্তু এখনও অবধি সবার সমস্যা সামলানোর জন্য -বাস্তবে নেমে আসেনি । এই যা দু:খের ।

বাড়িটি ওদের একটু পুরনো। তাই পোকামাকড় হয়।

হিটার ইত্যাদির সমস্যাও আছে। তবুও এরমধ্যে এক অদ্ভুত শান্তি আছে। রাতে , ক্লাস সেরে ফিরতেই খাওয়া সারে। তারপর একটা আড্ডা দেয় ওরা। এরপরে যখন শুতে যায় তখন এমনিই ঘুম এসে যায়। কোনো মেডিসিন খেতে হয়না ঘুমের জন্য। না মদ্যপান করতে হয়। সবই এই বাসাটির গুণ। শান্ত এক নীড়। শীতকালে ওরা কাঠকুটো যোগাড় করে ফায়ারপ্লেসে আগুন জ্বালায়। হিটার না চললেও অসুবিধে হয়না। কাঠ অবশ্যই কিনে আনতে হয়। ওরা পালা করে আনে। এক এক সপ্তাহে- এক এক জন। সেখানে কফির কাপ নিয়ে বসে সবাই কফিপান করে। কখনো বা বড় বড় কাঁচের জানালার সামনে বসে বাইরের দৃশ্য দেখে। ঝরে যাওয়া ফুল, ফল, নানান রং এর পাখির গান অথবা নিতান্তই কোনো

পথভোলা মানুষের পদচারণা । ওদের বাসার উল্টোদিকে- একটু দূরে, একটা ফাস্ট ফুডের দোকান আছে । দুজন অ্যাফ্রিকান যুবক চালায় । একজন সবসময় থাকে । অন্যজন মাঝে মাঝে । আর ওদের কারো বউ বা পার্টনার থাকে । ছেলেগুলো খুব ভদ্র ও নম্র । মুখে সবসময় হাসি লেগে আছে । ওখানে নানান আকারের কাবাব পাওয়া যায় । গরু, ভ্যাড়া, পাঁঠা, মূর্গী, টার্কি ইত্যাদির কাবাব পাত্‌লা করে কেটে কেটে, মোটা ও নরম রুটিতে পুড়ে দেওয়া । সঙ্গে স্যালাড্ । আলু, ফুলকফি, ডিমের কাবাবও মেলে । ক্রিকেট বলের সাইজে এক একটি জুকিনি বল, কিনতে পাওয়া যায় । ব্যাসনের বল- ভেতরে জুকিনি ভরা । সেটা একটি আজব সসে চুবিয়ে খেতে হয় । দারুণ লাগে । মেহেরদের হেঁশেল বন্ধ থাকলে ওখান থেকে এনে খায় । তবে দামটা একটু বেশি । ফুল মিল্ ২৬ থেক ৩০ টাকার মধ্যে পাওয়া যায় । একজন অবশ্য একটি মিল দুই বেলা খেতে পারবে যদি একান্তই পেটুক না হয় ।

মেহেরের ঐ জুকিনি বল, সর্ষের সস্ দিয়ে সবচেয়ে ভালোলাগে । আজকাল লোকে স্বাস্থ্য সচেতন হয়ে পড়ায় ও ফাস্ট ফুডের রমরমা কমে আসায় ওরা নতুন পলিসি নিয়েছে । স্বাস্থ্যকর ফাস্ট ফুডের চল শুরু

হয়েছে । তাই ঐ দোকানে লিন্ মিট ,তাজা ফার্মের অনেক সবজি ও ফল মেলানো স্যালাড্ , হাল্কা তেল,

সুগার ফ্রি জিনিস আর মাল্টিগ্রেন রুটি মেলে । বিকিকিনিও অনেক । দেখা যায় একটা জানালা থেকে **। আকাশছোঁয়া কাঁচের জানালা দিয়ে, বাইরের শেয়ার মার্কেটের দৃশ্য মনোরম লাগে । এক টুকরো আলো আর এক চিলতে রোদ্দুর আসে, সময়ের বেড়াজাল ভেদ করে । যেন ওদের মুঠিতে ধরা দেবে বলেই !!**

ওরা পালা করে করে বাড়ি সাফ্ করলেও, জলি যখন কাজ করে তখন ওদের মধ্যে প্রায়ই ঝামেলা হয় । কারণ জলি ফাঁকিবাজি করে । ওর পড়তে ও ডেস্কে কাজ করতে ভালোলাগে । এইসব গৃহস্থের টুকিটাকি ওর অসম্ভব বাজে লাগে । ওকে অন্যরা ক্ষ্যাপায় :: সংসার হলে কী করবি ?

ও হেসে বলে :: বাচ্চাকে ক্রেশে আর হোস্টেলে রাখবো । আমি আর স্বামীদেবতা খাবার কিনে খাবো । ঘরদোর সাফ্ করবে বর আর জামাকাপড় -- ওয়াশিং মেশিন । বাজার করবো নাহয় আমিই, বিস্কুট, কেক্ ইত্যাদি বা পোশাক আশাক । বাজারে আমার কোনো অরুচি নেই ।

সত্যি ,জলির এক বয়ফ্রেন্ড ছিলো কিছুদিন । সে নাকি জলির মেক-আপ্ পর্যন্ত করে দিতো । ওর বান্ধবীরা বলতো :: আমাদের এরকম একটা জোটেনা কেন ???

সে নাকি কাজ থেকে এসে রান্না করতো । সপ্তাহে একবার ঘরদোর ক্লিন করতো । পরে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায় । কারণ ছেলেটির মা অসম্ভব কন্ট্রোল ফ্রিক্ । তাই নিজের হীরের টুকরো ছেলেকে, জলি থেকে মুক্ত করে ফেলে চট্পট্ । নানান কু-পরামর্শ দেওয়া ও তা পালিত হচ্ছে কিনা সেই সম্পর্কে খবরাখবর নেওয়া , স্পাইং করা ; দেখে দেখে জলি সরে যায় সেই প্রেমিকের জীবন থেকে । ছেলেটি একটু আপত্তিই জানায় । ওর গলার স্বর মেয়েলি হয়ত তাই বান্ধবী জোটেনা । সহজে । জলিকে ছাড়তে চায়নি । জলিই গা ঝেড়ে ফেলে । ওকে বলে :: দেখো আমি মুভি স্টার নই । তোমার মায়ের এই দিবারাত্রি আমার পেছনে স্পাইং করা বা আমার পার্সোনাল লাইফ নিয়ে কৌতুহল দেখানো আমার মোটেই বরদাস্ত হচ্ছে না । যদি তুমি ওকে সরাতে পারো তো ভালো নাহলে আমি নিজেই সরে যাচ্ছি ।

মাকে সরানো সহজ নয় । তাই জলিকেই সরে যেতে হলো । মায়েরা সবসময়ই ছেলেদের বেশি আশ্কারা দেয় । বাংলায় কেন ভুবন জুড়েই ।

এখন জলি আর কোনো রিলেশানশিপে যাচ্ছে না চট্ করে । যাবার অর্থ হয়ত আরেক অপদার্থকে ঘাড়ে নেওয়া । এবার হয়ত আসবে বোনাস হিসেবে তার বাবা । জলি বাদামি মেয়ে বলেই সমস্যা । সাদা বা গোলাপী হলে হয়ত বয়ফ্রেন্ড পেতে, এতোটা সমস্যা হতো না ।

জলি তো ভিনদেশী মেয়ে ! এখানে এসেছে ঠ্যাকায় পড়ে । নাহলে নিজের দেশই সবচেয়ে ভালো । অন্তত: যুদ্ধ লাগলে সবার আগে যেতে হবেনা , লড়াইতে ।

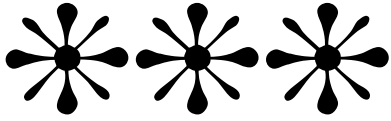

জলির বাস ছিলো পিপিং দেশে । বিরাট দেশ নয় । ছোট্ট দেশ । কমিউনিস্ট দেশ । একজন কমরেড বংশ পরম্পরায় রাজত্ব চালাচ্ছে । এখন তার তিন নম্বর বংশধর ওখানে শাসক । স্বাধীনতা বলে কিছু নেই । নেই হিউম্যান রাইটস্ এর বালাই । ইচ্ছে হলেই রাজামশাই হত্যা করেন । নিজের গদি ঠিক রাখতে নিজের দুই ভাই ও বোনকেও মেরে ফেলেছে । যাতে

উত্তরাধিকার সুত্রেও কেউ না আসে - পরে । **এরপরে রাজা হবে বর্তমান শাসক-- প্যাথেটিকং এর ছেলে হরিবেলং । তারই পথ পরিস্কার করা হল ।**

চুলের ছাঁট কয়েকটি মাত্র । সরকার স্থির করে দিয়েছে । তার মধ্যে থেকেই বাছতে হয় । কটা সন্তান হবে তাও স্থির করে সরকার ; আর নামও । কে কখন, কী কী পোজে মিলিত হবে- তাও সরকার দেখে । গুপ্ত ক্যামেরা সবার বাড়িতে লাগানো । **সিসিটিভি ফুটেজ শহর জুড়েই ।**

স্যাটেলাইট ও গুপ্ত ক্যামেরার কল্যাণের সবার জীবন এই কমরেডের নখদর্পণে ।

একই শ্রেণীর কর্মীরা সব্বাই একই বেতন পায় । ওদের হাতে অর্থ না দিয়ে কার্ড দেওয়া হয় । ক্রেডিট কার্ডের মতন । সেই ব্যালেন্স অনুসারে সুবিধে পায় । সবাই কয়েকটা মাত্র গাড়িই চড়ে । নিজের ও বাপ্-মায়ের জন্ম তারিখ না জানলেও রাজামশাইয়ের জন্মদিন সবার মুখস্থ আর সেইদিনে বিরাট উৎসব হয় । মোদ্দা কথা হল নেড়ি কুকুরেরও কোনো ফ্রিডম নেই ওখানে । সবাই সকালে উঠে সরকার বাহাদুরকে ফেসবুকে হুইশ করে । শুধুমাত্র কমরেড ও তার পরিবারকে খুশি করতেই ব্যবহৃত হয় সোসাল মিডিয়া সাইট । আর প্রতিটি মানুষ মাসে একবার করে যায় কমরেডের

পদলেহন করতে । **আক্ষরিক অর্থেই, মাটিতে শুয়ে তার পদযুগল চাটতে হয় ।**

জলির নাম ওর মা দেয়না, নতুন দেশের কাগজপত্র দেয়- জলি । হাসিখুশি মেয়ে সে । তাই । আগে মানে পিপিং দেশে, ওকে একটি ভজকট্ নাম দেওয়া হয় ।

লিং লং লুং লুং । এহেন টিংটং , ইডিওটিক নাম দেখে ওরা বদলে দেয় । কারণ লিং ,লং নাকি লুং কী বলে ডাকবে- ভেবে পায়না ওরা । ভুল হলে অন্য কেউ ভুগবে তার জন্য । লিং বললে লং আর লং বললে লুং । ওকে এও বলা হয় যে তোমাদের পিপিং দেশে কি লোকে খুব ঘন্টা বাজায় ? কথা না বলে শুধু ঘন্টাধ্বনি করে করে কমিউনিকেট করে ? এরকম কাতুকুতু দেবার মতন নাম কেন তোমাদের ?

জলিকে দেখতে কিন্তু মঙ্গোলিয়ানদের মতন নয় । হলুদ বর্ণ, ঈষৎ চাপা নাক ও সরু চোখের মেয়ে নয় সে ।

বরঞ্চ তার বর্ণ বাদামি । ওর বাবার মতন । ওর বাবা, অন্য এক দেশ থেকে অনেক আশা নিয়ে এই পিপিং দেশে আসে । কমিউনিস্ট দেশ । সবাই সমান । ওর

বাবা ; এক সময় নিয়মিত ফিদেল কাস্ত্রোর ফটো পুজো করতো । সিংহাসনে বসিয়ে , ফুলমালা দিয়ে , চন্দন ও ধূপ লাগিয়ে রীতিমতন পুজো ।ওদের গান শুনলে বুক কাঁপতো । বড় মধুর লাগতো সমাজবাদ । ওসব দেশে কোনো ধর্মীয় বাধা নিষেধ থাকবে না । আগে যেখানে ছিলো সেখানে ধর্মই সব স্থির করে । নির্মম সমাজ, প্রিস্টের অঙ্গুলি হেলনে চলে । কোনো লজিক মানেনা । সবই নাকি ফেথ্ ! এমনই ফেথ্ যার কোনো বেসিস নেই । ঐ দেশ থেকে অনেকেই পালিয়েছে আর বর্তমান সমাজে, **তারা নাকি নিজেদের আরাধ্য দেবতা জল্লাহ্ থাকলেও, নিজেদেরকে নাস্তিক বলে পরিচয় দেয় । আড়ালে বলে :: আমরা জল্লাহ্কে ঘৃণা করিনা , করি ফোল্লাদের । কারণ তারা গায়ের জোরে সবাইকে ফোল্লা করতে ইচ্ছুক ।**

ওদের ধর্মের মানুষের আজ মহাবিপদ্ হয়েছে সবকিছুতে ধর্মকে নিয়ে আসায় । প্রিস্টই রাজা । নাস্তিক মানেই নাকি লম্পট আর চরিত্রহীন । তাই ওরা ভয়ে পরজন্ম, ঈশ্বর ইত্যাদি মানেনা ।

ধর্মের নাম করে করে - অনেক সন্ত্রাসবাদ আর উগ্রপন্থী তৈরি হয়েছে । কাজেই র‍্যাশেনাল লোকেরা নিজেদের নাস্তিক বলেই চালায় । জনসম্মুখে ।

অনেক আশা নিয়ে, এই পিপিং দেশে গেলেও ভদ্রলোক নিরাশ হন । কারণ ওখানে ধর্ম না থাকলেও- অধর্ম কিছু কম হচ্ছেনা । কমরেড হল সমাজের মাথা । তার ইনফ্লেটেড্ ইগো দিয়ে সবকিছু চলছে । সমাজ তন্ত্রের পুঁথিতে লেখা-- অনেক ভালো ভালো কথা ও থিওরি মানা হচ্ছে না । **যেই সর্বগ্রাসী হিউমান ইগো থেকে বাঁচাবার জন্য এত পুঁথি ও ইস্তেহার , সেই ইগো দিয়েই মানবধর্ম পদদলিত হচ্ছে পিপিং দেশে । আর করছে প্রিস্টদের , নরেশদের বদলে- এক একজন কমরেড ।**

যোগব্যায়াম আমাদের দেহকে সুস্থ ও সবল করে । সবাই জানে । তাই জলির বাবা, ঐ ব্যায়ামের কলাকৌশল, পিপিং দেশে প্রচার করতে শুরু করে । এর সাথে ধর্মের কোনো যোগ নেই সরাসরি ।

এটা একটি হিলিং পদ্ধতি । যেই মহাজাগতিক্ চেতনার

ক্ষুদ্র অংশ আমরা , সেই চেতনার সাথে মিশে যাবার পন্থা একটি । এতে হায়ার মাইণ্ড সক্রিয় হয় আর অমৃত জ্যোতির সঙ্গে যুক্ত হতে পেরে আমরা সুস্থ হয়ে উঠি । নিজের মধ্যেই আছে সেই শক্তি । তাকে জাগ্রত করা হয় । কিন্তু পিপিং দেশ একে বলে কুসংস্কার । মানব দেহ চলে কিছু কোষ , রক্ত আর

জিনের জন্য । ওসব আলো ফালো কোথাও নেই । আলোর জন্য, মোম বা লম্ফ জ্বালাতে হয় । ভেতরে আলো থাকলে, রাতের বেলায় মানুষ দিয়ে পথঘাট দেখা যেতো ।টর্চ লাগতো না -- ইত্যাদি তাদের নিজস্ব লজিক ।

তাই গোপনে ভদ্রলোককে শাসানো হল । আর পরে রেডিও-অ্যাকটিভ জিজিয়াম দিয়ে হত্যা । একটা খুব ছোট মেশিন যাকে মাইক্রো মেশিন বলা চলে , কোনো তরলের সাথে দেহে প্রবেশ করানো হয় । কফি, পানীয় ইত্যাদি । সেই বস্তুটি দেহে প্রবেশ করেই নিউক্লিয়ার বোমের মতন বার্স্ট করে আর অঢেল বিকিরণ বার হতে থাকে । নিউক্লিয়ার বোমায় বাইরে যা হয় প্রায় সেরকমই এই চিপটি করতে পারে অন্দরে । দেহের ভেতরে ।

এইভাবে পিপিং দেশই, সর্বপ্রথম মানুষ মারলো ।

এই যোগা কেন্দ্রে যার নাম শ্রীসিদ্ধায়তন , সেখানে নাকি টেররিস্ট তৈরি করা হচ্ছে । এই রকম প্রচার করা হয় । যোগের মাধ্যমে নাকি উগ্রপন্থীদের দৈহিক বল-বৃদ্ধি হচ্ছে ।

যারা শীর্ষাসন করতে পারেন না- অথচ করলে ভালো হবে তাদের একটি মেশিনের সাহায্যে উল্টে দেওয়া হত

। উল্টো করে ঝুলিয়ে রাখা যাকে বলে । জলির বাবাকে বিকিরণে মুড়ে, ঐভাবে রেখে দেওয়া হয় । ভদ্রলোক পরে মারা যায় ।

মিডিয়ার কোনো স্বাধীনতা নেই- পিপিং দেশে । তবুও লোককে বলা হয় যে এই বিদেশী, এই দেশে এসে উগ্রপন্থী তৈরি করছিলো । তাই মরে গিয়ে মঙ্গলই হয়েছে । **ও নিজে দেহত্যাগ করেছে ।** বুঝতে পেরে যে সরকার ওকে এবার ধরবে আর শাস্তি দেবে । কুপ্রথা ও অন্ধ বিশ্বাসের যোগশাস্ত্রে, অনেক রহস্যের সাথে সাথে নাকি দেহত্যাগ করার পদ্ধতি লেখা আছে । অনেক যোগ শিক্ষকই নাকি দেহত্যাগ করে থাকে ।

লোকে বুঝলো যে যোগের নেগেটিভ দিক বলে দেহত্যাগকে স্বীকার করা হচ্ছে , পজিটিভ দিক নয় । তবুও সবাই নির্বাক ।

ঐ কেন্দ্রের সাথে যুক্ত সমস্ত মানুষকে এরপরে জনসমক্ষে চাবকানো হয় ও গুলি করে মারা হয় । ।

বাবার হত্যার অনেক আগেই ; বাবা পিপিং দেশের এইসব অরাজকতা দেখে দেখে অতীব দু:খ পেয়েছিলো । সব সময় বলতো :: কোথাও সুখ নেই ।

ধর্ম, অধর্ম, কমিউনিজম্ সবই শেষে হয়ে ওঠে হিটলার পন্থী । যে যায় লঙ্কায় সেই হয় রাবণ । রাবণের তাও অনেক গুণ ছিলো । শ্রীলঙ্কায় গেলেই জানবে । কিন্তু এরা নরখাদক । বংশ পরম্পরায়, এরা মানুষ মারার ব্যবসা করছে । বাইরে গাল ভরা বুলি আর অন্তরে হিংসার বাণ । বাবা খুব ভেঙে পড়ে শেষদিকে । তাই যোগ ব্যায়াম কেন্দ্রে সরকারি রেড্ হবার অনেক আগে থেকেই বাবা প্রস্তুত ছিলো এসবের জন্য ।

মূলত: বাবার ইচ্ছেতেই জলি ও তার মা ঐ দেশ থেকে পালিয়ে যায় । ওর বাবা বলতো :: আমি আর যেতে পারবো না এই কর্মকান্ড ফেলে । তোমরা পালাও । স্ত্রীকে বলতো, মেয়েকে নিয়ে চলে যেতে ভালো কোনো দেশে । যদি মেয়েকে মানুষের মতন বাঁচতে দিতে চায় । এই মগের মুলুকে কোনো মানুষ নেই ।

যাদের সুন্দর , সুস্থ , স্বচ্ছ সমাজ গড়ার কথা, তারাই এক একটা দু:শাসন ও কংস হয়ে উঠছে ।

মানুষের আর কোনো আশা নেই । সব শেষ ।

এমনই ভেঙে পড়েছিলো তার বাবা ।

এমনিতে বাবা তার নিরাশাবাদী ছিলো না । সেটা তার জীবনের ওপরে চোখ বোলালেই বোঝা যায় । তবুও সেই মানুষই শেষদিকে, এমন সব ভয়ঙ্কর নিরাশার কথা আওড়াতো ।

পিপিং দেশের চা বাগানে ও অন্যান্য কারখানায় নাকি লক্ষ লক্ষ শ্রমিক খুন হতো । অনেক সময় তারা সরকারের বিরুদ্ধে প্রচার করতো ও ব্যবসা যাতে লোকসানে চলে তার জন্য , চেষ্টার কোনো ত্রুটি রাখতো না । তখন চা গাছের হাঁটু সমান ছায়ায় ও পাহাড়ের ঢালে, সরকার পক্ষ থেকে এলোপাথারি গুলি ছুঁড়ে কর্মরত শ্রমিকদের মারা হতো । নানান গন্ডগোল লেগেই থাকতো মানুষের তৈরি সরকার , মানুষের জন্য সরকারের সাথে ; মানুষের বা কমন লোকের ।

জলির মা-ই, তাকে এই সাদাদের দেশে নিয়ে আসে । অনেক কষ্ট সহ্য করে । ওরা উটে করে পালায় । মরুতে গিয়ে । উটেরা এক দেশ থেকে অন্য দেশে চলে যায়, মরু বরাবর । অন্য দেশে- অন্য রাজা ও শাসন ব্যবস্থা । পড়শী দেশ থেকে ওরা নৌকো করে সমুদ্রে ভাসে । পরে এক দ্বীপে গিয়ে আশ্রয় নেয় । সেখানে অনেক মানুষ , সাদাদের দেশে ঢোকার জন্য অপেক্ষারত । ছোট্ট দ্বীপ আর সাদাদের তৈরি করা অসংখ্য ব্যারাক সেখানে । এইসব উদ্বাস্তুদের জন্য নির্মিত । সেখানে জগাখিচুড়ি সমাজ । কালো , বাদামি ও হলুদ মানুষের ভীড় উপচে পড়ছে । সুস্বাস্থ্য ও সুরক্ষা, কোনোটাই নেই ।

নিয়মিত ধর্ষিত হয় মেয়েরা । অন্যরা চুপ করে থাকে যাতে তাদের কেউ না রেপ্ করে । শিশুদেরও রেপ্ হয় । অনেকেই মারা যায় । আর চিকিৎসক না থাকায়, কেউ অসুস্থ হলে- যদি তা বড় অসুখ হয় তাহলে মারাই যায় শেষ অবধি ।

বহুদিন ঐ এলাকায় ছিলো জলি ও তার মা ।

কিন্তু সাদা দেশ, তাদের ঢুকতে দিতে চায়নি ।

সমস্ত আশা ছেড়ে দেবার পরে একদিন ওদের সবাইকে জাহাজে করে, অন্য একটি দ্বীপে নিয়ে যাওয়া হয় । সেখানে আগের চেয়ে ভালো ব্যবস্থা ছিলো । মোটামুটি সেফ্ -ও । কিন্তু মূল ভুখন্ডের কোনো সুবিধেই নেই । কিছু আর্মির লোক পাহারা দিতো ওদের । এক পরাধীন দেশ থেকে আরেক পরাধীন দ্বীপে । পরাধীন মানে, মানুষ এখানে স্বাধীন নয় । ত্রিশঙ্কু হয়ে আছে মানুষ । বাজ পড়া আর বাজ পাখির ছোঁ মেরে সব নেওয়ার সাথেই বয়ে চলেছে জীবন ।

আক্ষরিক অর্থেই বয়ে যাচ্ছে । কেবল অজস্র ঢেউ ওদের আঙিনায় আর ব্যারাকের সীমানায় ।

কখনো ভাঙছে, কখনো বা নিজেকে সাজিয়ে নিয়ে আবার নতুন রূপে আসছে । কিন্তু ফেনা থাকলেও সেই জলে কোনো মাধুর্য্য নেই । লবণ জলে নেই, হ্রদের জলের মিষ্টতা । **আর সভ্যতার ফেলে দেওয়া অসংখ্য বস্তু মাখা এই ঢেউ ; বিষে ভরা ।** তাই মৃত্যুর দূতও বলা যায় । মাঝে মাঝে ওদের দ্বীপের ধারে , চড়ায়- অজস্র মাছ , মরে পড়ে থাকে । পড়ে থাকে প্লাস্টিকের সব প্যাকেট । তাতেই বেশ বোঝা যায় যে

ঢেউ এর স্ফুলিঙ্গে সজ্জিত হলেও ; এই ফেনা সমৃদ্ধ জলরাশির সাব্‌স্ট্রাটামে-(substratum) আসলে বয়ে চলেছে এক দুরন্ত ঘূর্ণী ।

যার স্নেহের পরশও আনে সুনামী । এমনই তার অস্তিত্বের বাহার । আজ অবশ্য এই দ্বীপটা আর নেই । এক প্রচন্ড সামুদ্রিক ঝড়ে এই দ্বীপ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে

। অবশ্য তখন সৌভাগ্যবশত: কোনো মানুষ - উদ্বাস্তু কিংবা আশ্রিত ওখানে ছিলো না । এই যা রক্ষে ।

জলি ; এই দ্বীপে অনেক রকমের মানুষ দেখেছে । সবাই-ই প্রায় এসেছে একটু ভালো করে বাঁচবে বলে । কেউ কেউ কোনো কুকর্ম করে পালিয়েছে । কেউবা মনের দু:খে , দারিদ্র্যে , হতাশায় নতুন দেশে যাবার কথা ভেবেছে । অনেক ধাঁচেরই এখানে আছে -তবে মিলেমিশে ।

সবসময়, সবাই হয়ত সবার সাথে মেশেনা অথবা কথাও হয়না কিন্তু দরকারে লোকে হাত বাড়ায় । কাজ সবাই মিলে করে । একটা কমিউনিটির মতন । ময়লা সাফ , একটি বিরাট উনুনে রান্না , টয়লেট সাফ সবই নিজেরা ভাগাভাগি করে নিয়ে করে ।

এখানে সরকার কোনো হেল্প পাঠায় না । কেবল দানা শস্য , পাউরুটি , অল্প সাবান , পেস্ট আর মাঝে মাঝে হোলসেলে কিছু মেডিসিন । ব্যস্ । মিনিমাম সমস্ত জিনিস । বড় অসুখ হলে লোকে মরে । অনেকে বলে সরকার সেটাই চায় । যত মরবে তত ওদের মূল ভূমে কম লোক যাবে । সমাজে কম চাপ পড়বে । কেউ কেউ নিজেদের পশুর সাথে তুলনা করে । বলে

:::: আমরা অন্তত: শেঁয়াল , নেকড়ের চেয়ে ভালো আছি ।

তখন প্রতিবাদ করতো জলি । লোককে হাসানোর জন্য, লোকে ওকে জোকার নামে ভূষিত করে ।

জলি বলতো :: **নিজেকে পশু না ভেবে মানুষ ভাবতে ক্ষতি কী? একটু দুখী মানুষ । এই আর কি !**

তা আর কী করবে বলো , যার যেমন কপাল । আমরা তো বদলাতে পারবো না- তবে এই সরকার তো তাও আমাদের, ওদের উন্নত দেশে ঢোকাবার ব্যবস্থা করবে বলছে । আর যাবো বললেই হয়না, ওখানকার সমাজে গিয়ে কাজ না পেলে- না খেতে পেয়ে মরবে । নিজেকে উপযুক্ত করতে হবে তো ! তাই না ?

জলিকে সবাই বলে জোকার আর গ্র্যান্ডমাদার ।

ওর অযাচিত জ্ঞানদানের জন্য । তবে এই কথাগুলো যে বললো সেটা যথেষ্ট দামী ।

ও একজনকে দেখেছে যে নাকি একটি সংস্থা চালাতো । ওদের পিপিং দেশে । সেই ব্যাক্তি , জনগণের দানের ওপরে নির্ভর করে কাজ করতো । কমিউনিস্ট দেশ , লোকে ওখানে থিওরি অনুসারে সমান । ভদ্রলোক কেবল ডোনেশান চাইতো আর কারো সাথে কথা হলেই

ডোনেশান বক্স এগিয়ে দিতো । সব জায়গায়, নিজের সংস্থার নাম লিখে -ডোনেট করতে আহ্বান জানাতো ।

ওকে দেখে লোকে মজা করে বলতো :: কথা নয় ডোনেশান বেশি ।

এমনকি একবার ওকে , লোকে- পাবলিক টয়লেট অর্থাৎ বড় বড় দেওয়ালে গিয়েও লিখে আসতে দেখেছে যে --ডোনেশান প্লিজ ! এই সংস্থা ইত্যাদি ।

হাত সবসময় চিৎ করা , উপুড় হয়না ।

আর ওদের দ্বীপে তো কেউ ডোনেশান চাইবারও নেই , চাইছেও না । এমনিই ওদের দেশে ঢোকাবে, শুধু মূল ভূখন্ডে কবে তুলবে সেটাই কেউ জানেনা ।

পরে তো ওদের অন্য দ্বীপে নিয়ে গেলো । ওখানে অনেক সুবিধে পেতো ওরা । তারও অনেক পরে আসল দেশে গেলো । সে অনেকদিনের কথা ।

জলি বেশ কয়েকজন মানুষকে ওখানে দেখেছে যাদের কথা ওর সারাটা জীবন মনে থাকবে ।

যেমন রূপম সিং । ভারত থেকে এসেছিলো । নাম সিং হলেও, সে কিন্তু পাঞ্জাবী নয় । অন্য রাজ্য থেকে এসেছে । একাই ছিলো ওদের সাথে । ঐ দ্বীপে । ও নাকি শিল্পী । তাই দ্বীপে, সমস্ত দেওয়াল ও পাথরে এঁকে রাখতো । সিগাল পাখির ছবি, অন্যান্য পাখির ছবি , মাছ , ফুল , গাছপালা । বড় ভালোমানুষ সিং । জলির খুব দোস্ত হয়ে গেলো তো ।

সে আসলে দেশ থেকে পালিয়েছে । একটি সংস্থা, অনেক লোককে বিদেশে আসার ভিসা দেয় । তাদের টাকা দিয়ে ম্যানেজ করেছে । সিং আসলে একটি ফ্যাক্টরিতে কাজ করতো, যেখানে অস্ত্র তৈরী হয় । সরকারি কারখানা । বন্দুক, গুলি এসব বানানো হয় ।

একবার সিং অনেক রাত করে ঘরে ফিরছিলো । বাসায় ওর স্ত্রী ও দুই মেয়ে । তারা ছোট । স্কুলে পড়ে ।

কামিনী আর কাজল । কারখানায় সিং এর খুব নাম ছিলো । জেনেরাল ম্যানেজারও নাকি ওকে পার্সোনালি চিনতো এত ভালো কাজ করতো । অনেক পুরস্কারও পায় ।

একদিন রাতে, ঘরে ফেরার সময় সে নাকি দেখে যে সরকারি অস্ত্রাগার থেকে অস্ত্র লুন্ঠন হচ্ছে । ট্রাকে করে করে, পাচার হচ্ছে কোথাও । শীতের রাতে, বিরাট একটা চাদরে নিজেকে লুকিয়ে- খবর নিয়ে জানতে পারে যে এগুলি সীমানা পেরিয়ে অন্য রাজ্যে যাবে । তারপর ক্রিমিন্যাল অর্থাৎ টেররিস্টদের হাতে ।জলি এসব সিনেমায় দেখেছে- কিন্তু বাস্তবে যে এমন হয় তা জানতো না । আসলে কল্পনাও করতে পারতো না ; সিং এর সাথে পরিচয় নাহলে ।

সেই যে রূপম সিং ওদের জি-এম কে জানালো- ব্যস্ তারপর থেকেই কারখানায় পুলিশ রেড্ আর সিং এর জীবন নেবার হুমকি শুরু হল ।

ফলতঃ সিং পালিয়ে এলো । ওর স্ত্রী মনিষা, ওকে বললো :: আমি কোনোভাবে চালিয়ে নেবো । তুমি পালিয়ে যাও । নাহলে তোমাকে ওরা মেরে ফেলবে ।

মনিষা ওকে না করেছিলো, জি-এমকে জানাতে । বলেছিলো যে জগতে কত অন্যায় হচ্ছে । ওরা সাধারণ মানুষ । ওরা কীইবা করতে পারে ? নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে প্রশাসনকে জানালেই বা কী হবে ? বন্ধ হবে কি ?

কিন্তু রূপম সিং অন্যধরণের মানুষ । তাই স্ত্রীর কথা না শুনে ওপর মহলে জানায় । আর শেষে ওকে দ্বীপান্তরিত হতে হয় । একটি দেশী সংস্থা ওকে ভিসার ব্যবস্থা করে দেয় । বিশেষ ভিসা । আশ্রয় চেয়ে ভিসা । প্রাণভয়ে । দেশের কল্যাণে কাজ করেছে বলে ।

সত্যি, এরকম কিছু উন্মাদ--- সমাজে আছে বলেই, জীবনের চাকাটা আজও ঘুরে চলেছে । এমনই জলির মনে হয় ।

আরেক ভারতীয় ছিলো সেখানে। সে জাতে কী, জলি জানেনা কিন্তু কাজ করতো নুলিয়ার । নাম মদনমোহন কাঁসারিয়া ।

কিশোর বয়স থেকেই সে সমুদ্রে ; ট্যুরিস্টদের স্নান করাতো । বাবা ওকে কাজে লাগায় । ওর হাত ধরে কতনা মানুষ স্নান করেছে !! তখনও সে ঐ দ্বীপের কোণায় , সাগর কিনারায়- দিনের বেশিরভাগ সময়টা কাটাতো । খুব চটপটে ছেলে । কথা বলে খুব তবে একটু তোত্লায় ।

ওকে, ওদের এলাকায় একদিন রাজনীতির দাদারা ধরে-- মলেস্ট করার অপরাধে । আসলে কিশোরটি একটু বাঁদরামো করেছিলো তবে বড় কিছু নয় ।

একটি রূপসী মেয়ে একবার স্নানে নামে । ওর পরিবারও ছিলো । তারা অন্যদিকে স্নানে ব্যস্ত ছিলো । মেয়েটিকে স্নান করাবার দায়িত্ব পায় মদনা ওরফে মদনমোহন । তা নামটি যার মদনমোহন, সে একটু গোপিনী সঙ্গ করবে না তাই কি হয় ?

মেয়েটির সবে যৌবন আসছে । ডালপালা মেলছে ওর দেহ বৃক্ষে । দেহলতা ; লাজে নুয়ে পড়ছে । ঈষৎ ভারী, ওর দুই বক্ষ । বিভাজিকায় অবিনশ্বর রামধনু ।

লোভী হয়ে ওঠে মদনা ! মদনমোহন । তাই মোহনবাঁশি বেজে ওঠে, ওর প্রাণে । গোপিনীর উন্নত বক্ষ স্পর্শ করে সে বলে ওঠে :: অ্যাই , এটা তোর কী রে ? এমন নরম নরম ? তোর হাতের থেকেও নরম এগুলো । মাখনের বল নাকি রে ? তোরা সকালে যে পাউরুটিতে মাখন লাগিয়ে খাস্ , সেরকম ।

সত্য এতটুকুই । সেটাকে ফুলিয়ে, ফাঁপিয়ে- লোকে আরো অনেক অনেক বড় করে ফেলে ।

শেষকালে ঘটনা ; রটনার স্কন্ধে চড়ে -হয়ে দাঁড়ায় এই যে মদনা , মেয়েটিকে রেপ্ করে দিয়েছে ।

কাজেই মদনা, নৌকো করে পালায় । সমুদ্রে কাজ করতো --তাই সব জাহাজঘাট ও জেটি ওর চেনা । সেরকম একটি থেকেই- একদিন এই দূরপাল্লার নৌকোতে চড়ে বসে ।

একটি ছোট্ট ভুলের বশে, এই গরীব নুলিয়া ছেলেটি অজানা পথে পা দিয়েছে । স্বস্তির সমুদ্র জীবন, ছাড়তে বাধ্য হয়েছে । তবে মদনের বক্তব্য এই যে- মেয়েও কিছু সাধ্বী নয় । সেও নিজেকে ইচ্ছে করেই উন্মুক্ত করে, স্নানের সময় । নাহলে মদন ওকে স্পর্শ করবে কী করে ? ওকে নাকি বলেছে যে শুধু স্নান করাবি ? আর কিছু করবি না ? গা মোছাবি না ? তেল মালিশ করে দিবিনা ? পরে আবার নিজেই হুলু:স্থুল বাধায় । ওকে নাকি বলেছে মেয়েটির বাবা যে এই বয়স থেকেই যে কিশোর এইসব নোংরামো করছে সে নাকি পরে আস্ত মেয়ে গিলে খাবে অথবা নগ্ন হয়ে শুয়ে থাকবে সমুদ্র কিনারায় ।

ভাগ্যিস্ মানুষের চিন্তা স্রোত দেখা যায়না।।

জলির বেশ মনে পড়ে হরিজনের কথা । ওরা জাতিতে হরিজন । কিন্তু এই দ্বীপে সে আসে জন নামে । ও গরীব দেশ থেকে এসেছে । একবার ও একটি গেঞ্জি পড়েছিলো ,বাজার থেকেই কেনা । সেখানে লেখা ছিলো :: **তেরে বিন লাদেন কেমিক্যাল ।**

গেঞ্জি শিল্পীর উদ্দেশ্য ছিলো বলা এই যে-- ওরে লাদেন, তুই তো মারা গেছিস্ । এবার যত কেমিক্যাল জগতে আছে ; সব তুই ফ্রি । যেমন সুগার ফ্রি , ফ্যাট ফ্রি হয় সেরকম । লাদেন ফ্রি কেমিক্যাল । এইটুকু । কিন্তু পুলিশ ওটার মর্মার্থ করে এই বলে যে ওরে ও ব্যাটা লাদেন , তোর মৃত্যুতে আমরা আর জৈবিক নেই, একদম রসায়নের মতন টক্সিক হয়ে গেছি । তুই আমাদের রক্ষক ছিলি- তাই আমরা জীবিত ছিলাম । এখন তুই নেই আর আমাদের প্রাণ নেই । আমরা পুরো কেমিক্যালি বেঁচে আছি ।

জনের বিরুদ্ধে- উগ্রপন্থাকে হাইলাইট ও গ্লোরিফাই করার অভিযোগ আসে এবং সে জেল খাটে ।

অত্যন্ত ব্যাথার সাথে বলে ওঠে নিরস বদনে ::আসল লোকেদের না ধরে আমাকে ধরে কী হবে ? ঘেচু হবে ।

কচু হবে । আর ওরা ভালো করে তদন্তও করেনি । আসলে ওদের একজন কাউকে দরকার ছিলো হয়ত ।

পরে মুক্ত হলেও, সুস্থ সমাজ ওকে নিরীহ ভাবে না । কাজেই ওর জীবন- হরিজন হিসেবে যতনা দু:খের ছিলো- এখন আরো কঠিন হয়ে যায় । একে দলিত তার ওপর ক্রাইমে যুক্ত । ওকে কে কাজে নেবে ? মূল সমাজে জায়গা দেবে ? কাজেই ওকে পালাতেই হয় । আর হরিজন থেকে ও হয়ে যায় জন । জলির সাথে ওর এখনও মাঝেমাঝে দেখা হয় । ও একটা বড় জায়গায় কাজ করে । জন, পার্কিং ইন্সপেক্টর হিসেবে এখন কাজ করে । গাড়ি ; টিকিট কেটে পার্ক করেছে কিনা , সময় বয়ে গেলো তবুও রাখা কিনা এইসব দেখে । এখন ও একটু বুড়িয়ে গেছে । সবসময় একরঙা জামা পরে । আর কোনো লেখা জোকা নেই তাতে । বলে :: **পাগল? আমরা দাগী আসামী নই। একবার গেছি , মারধোর খেয়েছি, সহ্য হয়েছে । বারবার পুলিশের টর্চার সইবে না । আর এতো বিদেশিয়া ভূমি ! এখানে কী হবে, কেউ জানিনা আমরা ।**

জলি আর ওর মা যেমন ওখানে ছিলো, সেরকম কিছু মানুষ পরিবার নিয়েও ছিলো । তারই একজন হল স্যাম । স্যামুয়েল । ও কোনো ক্রাইম করেনি । ক্রাইম ধরেওনি । ও একজন সংসারী মানুষ । বৌ ও দুই

সন্তান । একজন এই বছর দশেক হবে । অন্যজন বছর তিন-চার হবে । ইন্দ্রানী আর ঈশানী । স্যামের বৌ হিন্দু । ওর নাম শিবানী । স্যাম কাজ করতো ম্যাজিশিয়ান হিসেবে । ছোট একটা দল নিয়ে কাজ করতো । ভালো আয় করতো ।

এই দ্বীপেও --ওকে সবাই ম্যাজিক দেখাতে বলে । তাদের ধূসর জীবনকে রং-এ চোবানোর জন্য ।

স্যাম শুনেছে যে- বিদেশে ওদের আরো নামধাম হতে পারে আর পয়সাকড়ি । তাই নিজের দোতলা বাড়ি , প্রতিষ্ঠিত ম্যাজিকের দল সমস্ত ছেড়ে- অন্য এক ম্যাজিকে আক্রান্ত হয়ে, স্বভূমি থেকে বিদেশের দিকে পা বাড়িয়েছে । সে জানেনা কোথায় তার তরী ভিড়বে আর কবে । ছেলেপুলেগুলোকে নিয়ে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে । হাতে সত্য ম্যাজিক ওয়ান্ড, তবুও জাদুকাঠির সন্ধানে, জাদুকর ও জাদুকরী আজ এই নির্জন দ্বীপে । দুই শিশুকে নিয়ে । তাদের না আছে খাবারের ঠিক, না স্বাস্থ্যের । এই অস্বাস্থ্যকর বনভূমিতে ওরা ভগবান ভরসায় আছে । যে কোনো সময়, কোনো কঠিন ব্যামো হলেই জীবন দীপ নিভে যাবার সম্ভাবনা ।

সবাই স্যামকে বলে, তাদেরও জাদুকাঠির সন্ধান দিতে কিন্তু স্যাম নিরুপায় ।

এখন নাকি অনেক সময়ই, সরকারি রেশন না এলে অন্যরা যখন উপোস করে তখন ওর বাচ্চা দুটি কাঁদে । স্যাম নাকি, ওর স্ত্রী শিবানীর অনিচ্ছায় সত্ত্বেও ঐ শিশু দুটিকে আইস খাওয়ায় । আইস হল একটি ড্রাগ্‌স্‌ । ক্ষুধার জ্বালায় ওরা যখন বিদ্রোহী, তখনই ওদের নেশায় মাতায় এই জলবিহীন বরফ । ওদের মনকে স্নান করায় । অলীক সুখে ।

এই বয়স থেকে এইসব নেশার জিনিসে অভ্যস্ত হলে- ওদের দেহে কিছু অবশিষ্ট থাকবে ? কিন্তু ওরা, ওদের বাবা ও মায়ের সন্তান । জলি কিংবা তার মায়ের নয় ।

কাজেই তারা যা স্থির করবে তাই হবে অন্ততঃ এই দ্বীপে । পরে হয়ত সাদাদের দেশে পৌঁছে গেলে, সরকার হস্তক্ষেপ করবে এই ব্যাপারে ।

তবে জাদুকরের (জাদুকরীর না অবশ্যই ; শিবানীও জাদু দেখাতো । ওদের জাদু দল , ইন্দিরার সেকেন্ড লিড্‌ ছিলো) যুক্তি হল এই যে- আগে প্রাণে বাঁচুক তারপর তো স্বাস্থ্য !! এখনি কেঁদে কেঁদে মরে গেলে তখন কী হবে ? তার চেয়ে কিছুক্ষণ রেস্ট পাক্‌ । ঘুমাক । হোক্‌ না তা নেশার ঘুমই !!!

দ্বীপে- নিত্য ব্যবহার্য জিনিস ও ওষুধ কম এলেও, নেশার বস্তু ঠিকই হাজির হয়ে যায় । কারা আনে আর কেন জলি জানে না ।

এরপরে মনে আসে রেমোর কথা । লাতিন আমেরিকার মানুষ । রেমো ; নিজের একমাত্র পুত্রকে কিডন্যাপ করে, নিজের স্ত্রীর কাছ থেকে পয়সা দাবী করবে বলে । ছেলেটি শিশু । স্কুলে যেতে শুরু করে সবে ।

রেমোর স্ত্রী একজন মিস্ ওয়ার্ল্ড । অনেক পয়সা তার । নিজে খুব হাই ফাই জীবন যাপন করতো । রেমোকে মোটে পয়সা দিতো না । রেমো অবশ্য ও মিস্ ওয়ার্ল্ড হবার পরে কাজ করা বন্ধ করে । আগে ও মেয়েদের নগ্ন ছবি তুলতো, নানান ফ্যাশান ম্যাগাজিনের জন্য ।

মোটামুটি কামাতো । খুব ভালো আয় কখনোই হত না । কাজ পেতোনা সেরকম । আসলে ও ফটো সেশানের আগে মেয়েগুলোকে এক্সপ্লয়েট করতো । তাই পরে আর কেউ আসতো না । ওর স্ত্রীও এইভাবেই ওর জীবনে আসে । পরে বিয়েও হয় । ওর বৌ নাকি বলতো যে কিছু পেতে গেলে কিছু দিতে হয় । তাই শয্যায় গেলেও তার সমস্যা হয়নি ।

রেমোর বৌয়ের ভাষায় --এও আরেক বয়ফ্রেন্ড বা ডেট -এরকম মনে করলেই হয় ।

সেই বৌ ওকে ঠকালো । একটা কড়িও দিলোনা । তাই অভাবের তাড়নায় সে নিজের বাচ্চাকে কিডন্যাপ করে । প্ল্যান পায় কোনো সিনেমা থেকে ।

শিশুটি পরে অবশ্য মারা যায় । কোনোভাবে সাফোকেশান হয়ে । একটি পুরনো গ্যারেজে ওকে রেখেছিলো, রেমো । নিজের বাচ্চাকে তো মারবে না কখনোই- কিন্তু ভাগ্যের পরিহাসে সেও মরে গেলো আর স্ত্রী ওকে কেসে ফাঁসিয়ে দিলো । আসলে শিশুটি মারা যেতেই---রেমো, ইমোশনালি ভেঙে পড়ে, তাকে নিয়ে ছুট্টে চলে যায় তার মায়ের কাছে । নিজের সব অপরাধ স্বীকার করে, ক্ষমা চাইবার জন্য । নিজের সমস্ত দু:খ, বৌকে খুলে বলার জন্য । কেমন হিংসা হয় তার ,বৌকে অন্য পুরুষের বাহুতে দেখে দেখে । কিন্তু বৌ মার্থা একটুও না কেঁদে, ওকে পুলিশের হাতে তুলে দেয় প্লাস এও বলে অফ দা রেকর্ড যে শিশুটি মরে গিয়ে ভালই হয়েছে । আপদ গেছে । এ এক বন্ধন হয়ে দাঁড়িয়েছিলো মার্থার কাছে, কেরিয়ারের কাছে । ঈশ্বর যা করেন মঙ্গলের জন্যেই করেন ।

‘Ice’ and ‘crystal meth’ are common names for crystal methamphetamine – a very powerful amphetamine. It looks a little like sheets of glass or ice, and people smoke, snort or inject it. It's also called meth, crystal, shabu and glass.

Information from Internet…..

আর সব শেষে মনে পড়ে চৈনিক মানুষ ; কালীকং এর কথা । সুদূর চীনদেশ থেকে, বিদেশে আসছিলো নৌকো করে । নৌকো ডুবে যায় । পাড়ের কাছেই ছিলো ওরা । তাই সাঁতরে ওঠে । মাঝ সমুদ্রে যাবার মতন শক্ত নৌকো নয় ওগুলো । ওখানে অনেক শিশু শ্রমিক কাজ করে । আর নৌকো ; ভাগ্যের ভরসায় জলে ভাসে । যদি পৌঁছে যায় ভালো, নাহলে মৃত্যু । পথে শিশু শ্রমিকদের দিয়ে রান্না করানো , নৌকো সাফ এইসব করানো হয় । কখনো বা জলদস্যু আক্রমণ করে । তখনো মৃত্যু হতে পারে । সঙ্গে যা আছে তা দিয়ে দিলে যদি ওরা চলে যায় ভালো-- নাহলে মেরে ফেলে রেখে যেতেও পারে । মূলতঃওরা খাদ্যদ্রব্য নেয় । অনেক সময় সোনাদানা থাকলে, তাও নিয়ে যায় ।

কালীকং- এরকম এক বোটে চড়ে , বিদেশে পাড়ি দেয় । আসলে চীনদেশে ও ডাক বিভাগে কাজ করতো । সেখানে ও অফিসের আড়ালে, প্রজাপতি চোরাচালানের কাজ করতো । ওখানে নাকি মৃত এই পতঙ্গের দাম অনেক । হাজার হাজার মার্কিনী ডলার । তাই সে এই কাজে জড়িয়ে পড়ে কিছু উপরি আয়ের জন্য ।

--টাকার দরকার কার না থাকে বলো ? একটু ভালো খাবো , পরবো ---অন্যায় তো নয় তাই না ? একটাই জীবন তো । কী ভুল করেছি বলো ? সবাই তো সোনার চামচ মুখে নিয়ে জন্মায় না !

জলিকে প্রশ্ন করতো । জলি আর কী উত্তর দেবে ? তার নিজের অবস্থাই তো সঙ্গীন !

এই দ্বীপে একটা জিনিসের প্রচলন ছিলো । নতুন কারো সাথে দেখা হলেই তাকে প্রশ্ন করা ::: কোন অপরাধে এখানে ?

ইদানিং আর নতুন নৌকো আসেনা । ওরা মোট কিছু মানুষই স্থায়ী বাসিন্দা । সরকার ওদের কবে নিজের দেশে নেয় তার জন্য মুখিয়ে আছে । তাই এই প্রশ্ন করাটাও অনেকদিন যাবৎ বন্ধ আছে ।

প্রজাপতি অনেকের কাছে শুভ একটি চিহ্ন । কিন্তু সেই শুভ থেকেই, চরম এক অশুভ লগ্ন স্পর্শ করেছিলো কালীকং-কে । তার মেয়ে ও স্ত্রী চীনদেশেই আছে । কালীকং নাকি এখন ধ্যান করে । ওর স্ত্রী করতো । সে বৌদ্ধ্য ছিলো । আগে কালীকং হাসতো । বলতো :: কী গাঁজাখুড়ি এসব করছো ? চোখ বন্ধ করে ঘন্টার পর ঘন্টা , বোর লাগেনা ?

আর মন মৃত হলে চিন্তা করবে কীভাবে ? তখন তো জড়ভরত হয়ে যাবে !! আমার বাবা, বিকল ব্রেন হবার ইচ্ছে নেই একটুও ।

আসলে তখন বুঝতো না । ভাবতো মনকে মেরে ফেলা মানে জড়ভরত হয়ে যাওয়া । আসলে তো তা নয় । মনের নেগেটিভ সত্ত্বাকে মেরে ফেলে, পজিটিভ থাকা । নেগেটিভ ও ধ্বংসাত্মক চিন্তাকে মুছে ফেলা আর শুদ্ধ চেতনার স্পর্শে সবসময় থাকা । আনন্দে থাকা । হর্ষে থাকা । বিষাদে নয় । এটাই সবার ফাইনাল রেস্টিং প্লেস । পজিটিভের এতই শক্তি যে তখন মন বিনা সবকিছু হবে । ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় জাগ্রত হবে । তৃতীয় নয়ন খুলে যাবে । চোখ ছাড়াও দেখা যাবে আর মন ছাড়াও ডিসিশান নেওয়া যাবে । **নিজের স্বরূপ, সৎ-চিৎ -আনন্দ ফুটে উঠবে ।**

দিবস রজনী ---মহাকাল আছে জাগি ---সেই বিখ্যাত লাইনের মতন ।

এখন কালীকং বুঝতে পারে যে ধ্যান করলে কত আনন্দ পাওয়া যায় । এই যে তার এত দু:খ, সব নিমেষে ধুয়ে মুছে যায় । হৃদয় সাফ হয়ে যায় ।

লোকে ভাবে সে একা । লোনলি । কিন্তু নাহ্, যারা মেডিটেশান করে, তারা জানে যে একা কেউ থাকতে পারেনা । সবসময় তার সাথে মহাজাগতিক চেতনা আছে। আর কেউ নাহলেও ।

কালীকং এখন শান্তিতে আছে।

--নাম যার কালী, সে অশান্তিতে থাকলে চলে ? বলে ওঠে জলি । ---জানো তো, কালী এক হিন্দু গডেস্ । খুব শক্তি আছে তাঁর । আর কং-টা আর বলোনা কাউকে । ওটা বাদ যাওয়াই ভালো । কং শুনলে কিরকম কিংকং বলে মনে হয় ! তুমি তো আর চিম্প্ জাতীয়, পশুশ্রেণী নও আর যাই হও ! কী বলো ?

সবাই হেসে ওঠে এসব শুনে ।

যেন কালকের ঘটনা সব । এমনই মনে হয় জলির ।

চোখের সামনে এসব মানুষগুলো ভাসে । আজ ওরা সবাই মূল ভুখন্ডে আশ্রয় পেয়েছে । একজন তো পার্কিং ইন্সপেক্টর । জলি নিজের জীবন নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে । অন্যদের খবর জানেনা । তবে একবার শুনেছিলো যে ঐ জাদুকর, এই দেশে নাম করেছে ।

ওর দুই মেয়ে বেঁচে আছে আর ওরাও আস্তে আস্তে বাবা ও মায়ের সাথে জাদুতে হাত পাকাচ্ছে ।

এখানে রবিবার বিকেলে, টিভিতে একটা অনুষ্ঠান হয় । এই বিকেল তিনটে নাগাদ । এক ঘন্টা ধরে চলা এই আসরে, এমন সব মানুষকে আনা হয় যারা অসম্ভব লড়াই করে বেঁচে আছেন । আসরের নাম হরাইজোন্ । দিগন্ত । সেখানে ঐ ইন্দ্রানী ও ঈশানীকে এনেছিলো একবার । ওদের, শৈশব থেকে ড্রাগ্স্ নেবার অভ্যাসটাও দেখানো হয় । হয়ত এই উন্নত দেশের পরশে, ওদের জাদু ---বিশ্বব্যাপী এক নাম হয়ে উঠবে । ওদের বাবা ও মায়ের ইচ্ছে অনুসারে ।

জলির, গর্বে বুক ফুলে উঠেছে- শিশু দুটিকে টিভি স্ক্রিনে দেখে । সেদিনের দুই ক্ষুদে মানুষ আজ কৈশোরে পা দিয়েই ,জাদুর জগতে শিহরণ আনছে । আর তাদের জলি ব্যাক্তিগত ভাবে চেনে । একসাথে বসবাস করেছে একসময় । আনন্দ হবে বৈকি !

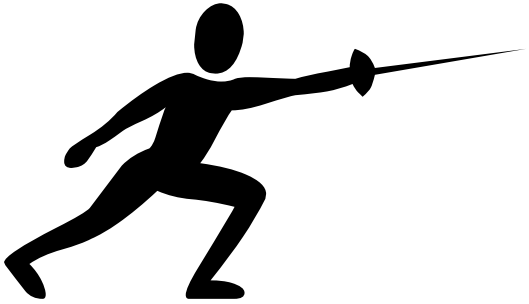

সবার কথা মনে পড়ে খুব । আজ যারা কাছে থাকে, কাল তারা দূরে চলে যায় । কিন্তু হৃদয়ের কাছাকাছি থেকে যায় অনেকেই । এরা ; জলির জীবনে এমনই কিছু চরিত্র । এবং এইসব চরিত্ররা জীবন্ত । এদের প্রাণ আছে । **লেখকের তুলিরেখায় বাঁধা, কোনো অজৈব অবয়ব নয় ।**

কতসময় জলি, সমুদ্রের পাড়ে বসে ঢেউ এর আনাগোনা দেখতো । চুপ করে বসে থাকতো । দিগন্ত মিথ্যে --তা জানতো, তবুও ভাবতো একদিন হয়ত কোনো জাহাজে করে ঐ দিগন্তে পৌঁছে যাবে আর ওখানকার অমৃতের স্বাদ নেবে । যা কেউ পায়নি ।

নুলিয়া ছেলেটি , মদনমোহন বা মদনা ওকে অনেকবার বলেছে , **দিদি দেখোনা রোজ কত জাহাজ দূর থেকে চলে যায় । একটাও এই দ্বীপের দিকে, একটিবারের জন্যেও মুখ ফেরায় না ।**

মদন স্নান করতে করতে অনেক দূরে চলে যায় । দিনের বেশিরভাগ সময়-ই জলে কাটায় । বিকেলে

ব্যারাকে ফেরে । তখন জাদুকরের থেকে **আইস** নেয় । নেশা করে । এই দ্বীপে এসব কোথা থেকে আসে জলি জানেনা । হয়ত কোনো গুপ্ত সুড়ঙ্গ আছে । কে জানে ?

পরবাসে , এই তিনজনের-শেফালি, মেহের ও জলির ; মৃত্যুর পরে-ওদের বসবাস করার এই বাড়িটি যেটা ওরা টাকা জমিয়ে পরে কিনে নিয়েছিলো , সেই বাসাটি সরকারকে ওরা দান করে যায় । এই দেশের প্রতি কৃতজ্ঞতায় । ওদের আশ্রয় দিয়েছে । সুস্থ জীবন যাপনের সুযোগ দিয়েছে বলেই ।

সরকার পক্ষ অবশ্য বাড়িটির নতুন একটা নাম ও রূপ দিয়েছে । এটা সংরক্ষণ করা হয়েছে হেরিটেজ হাউজ হিসেবে । তিন-কন্যার বাসস্থান । তিন ভিনদেশী-রাজনন্দিনী নাহলেও অসামান্যা মেয়ের স্পর্শ, এরই আনাচে কানাচে । লোকে দেখবে , জানবে কত কি !

এখানে নতুন বৈদ্যুতিক হিটার আর ফায়ারপ্লেস একই সাথে আছে । অর্থাৎ পুরাতন থেকে নতুন দিনে বিচরণ । আছে ওল্ড লন্ড্রি , কিচেন দ্রব্য , কার্পেট , দরজা ও জানালার ডিজাইন । আছে অতীব পুরনো এক ফ্রিজ । চুল্লি , ফুলদানি , মোমদানি, বিরাট এক তালা ও তার চাবি, আসবাবপত্র আর পোশাক আশাক ।

কসমেটিক্স । চিরুনি , সাবান , ছোবড়া । কফি মেশিন ।সবই দেখার মতন । সত্যিকারের জিনিস সব । ওদেরই ব্যবহৃত । গোটা একটা যুগের ছবি- যেন নয়নের মাঝে ফুটে উঠেছে । ইতিহাস কথা বলছে । কোনো মিউজিয়াম থেকে নয় বরং এক জ্যান্ত বাসা থেকে, যেখানে আগের দিনের কিছু মানুষ ছিলো । রোবট নয় তারা । বোতাম টিপে তারা কাঁদতো না , হাসতো না । খিলখিলিয়ে হেসে উঠতো ; আবেগে । সেইসব জীবের স্পর্শ নিতে ; লোকে এই বাসায় যায় । নাম দিয়েছে সরকার বাহাদুর --- রুথিন ।

রথীন নয় , রুথিন । আবেগে ভরপুর এক ইমোশনাল জার্নি --রুথিন ভ্রমণ । হারানো আবেগ, নয়ন জল ইত্যাদি স্পর্শের কারণে । নয়ন ভেজে না আর । চোখে চশমা বা লেন্স এঁটে লোকে সদা ব্যস্ত হিসেব নিকেষে । প্রফিট অ্যান্ড লস্ ! জীবন আর জীবন্ত নেই , শেয়ার মার্কেট আর স্টক এক্সচেঞ্জ হয়ে উঠেছে যেন ।

প্রাচীন জিনিসের যে একটা মাধুর্য্য আছে ; যার ছোঁয়ায় পুরাতত্ত্ববিদেরা বারবার ওদের দিকে ছুটে যায় সেই ফিলিংস্-টা এখানে এলে পাওয়া যায় সহজে । সহজ , সরল, অনাড়ম্বর জীবন ছিলো তিন বোনের ।

পোকা মাকড়ের ওষুধ ভরা যন্ত্র , ফল কাটার ছুরি কী নেই সেখানে ? অথচ মানুষগুলো নেই । বাড়িতে আছে তাদেরই স্মৃতিমাখা সমস্ত বস্তু । সেগুলো ভীষণ জীবন্ত

। আর তাই দেখতেই উপচে পড়ে লোকে । ভিন্ন স্বাদের মানুষের, জীবন যাত্রার উদাহরণ আরকি !

একটি বাংলার পাল্কি আর রিক্‌শা আছে । সেই পাল্কি করে **হুম্ হু নারে হুম্ হু না** করে করে অথবা রিক্‌শা করে, লোকে এই বাড়ির বাগানে আর সীমারেখার মধ্যে ঘুরে বেড়াতেও পারে । ওগুলো সরকার এক্সট্রা রেখেছে, সংস্কৃতি অনুসারে । মিঠে পান আর রসগোল্লা, মুসলিমদের কাবাব আর সেই কমিউনিস্ট দেশের খাদ্য , জেসমিন টি ও সাপের মোমো যাকে ওরা বলে ছোমো , তাও পাওয়া যায় ।

আসলে শেষকালে জানা যায়, ওরা তিনজন একই পিতার- ঔরসজাত সন্তান । ওদের বাবা জাহাজের কাজ ছেড়ে, মেহেরের দেশে থিতু হয় । কিন্তু ওর মাকে মেরে ফেলতেই, লঘু পাপে গুরু দন্ড ; মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে কমিউনিস্ট দেশে চলে যায় । ফিদেল কাস্ত্রোর ফটোতে মালা দিতো । মন্ত্র জপের মতন- সবার সমান হবার কথা আওড়াতো । বামপন্থী গান গাইতো । সেখানে তাকে বিকিরণের সাহায্যে হত্যা করে ; কমরেড পক্ষ । আর মেয়ে জলি ও নতুন

ঘরণীকে স্কন্ধে নিয়ে **সময়** ; সাদাদের দেশের দিকে চলে যায় । আর মাঝে থেমে থাকে এক দ্বীপে ।

এই ঘটনাই , বাড়িটিকে মধুর স্পর্শ দিয়েছে ।

তাই রুথিন কটেজ, কেবল এক হেরিটেজ হাউজ নয় এক রহস্যে মোড়া আঙিনা । কোন সে মায়াবলে, তিন বোনের মিলন হল আর সরকার এদের বাসাটিকে ইতিহাসে তুলে আনলো তা কেউ জানেনা । যা জানে তাহল সত্য গরল যেমন সেরকম সরলও । সত্য তরল-ও । তাই বুঝি যেকোনো সময় আকার বদল করতে পারে । আমাদের কাছে যতই অবিশ্বাস্য হোক্ না কেন ! দিনের শেষে , ঘুমের দেশে তো একমাত্র সত্যই সঙ্গে থাকে । যখন সমস্ত মিথ্যে আড়ালে যায়, তখনই অসময়ের বৃষ্টির শীতল স্পর্শে শান্তির নিদ্রা আসে ।

রুথিনকে নিয়ে তথ্যচিত্র তো হল, এখন নাকি মুভিও হবে । বড় বড় মুভি স্টারের মধ্যে লড়াই শুরু হয়ে গেছে, কে লিড্ রোল নেবে তাই জন্য । সিরিয়াস একটা বিষয় কিনা , প্রাইজ পাবার চান্স আছে ।

সত্যিই , সাহেবরা পারেও বটে !!!

শেষে- যা লেখার তাই লিখলাম : :

সত্যি, আমার ভান্ডারে এত শব্দ নেই

যে একটা কবিতা গাঁথতে পারি !

সত্যি, আমার কাছে এত আবেগ নেই

যে রক্ত দিয়ে, ছন্দ সাজাতে পারি ।

আমি কন্ডাকটর্ নই ,

সুরের চরাই, উৎরাই এর মতন

আবেগের উত্থান পতনে ; বাজাই না বেহালা খানি !

লেখকেরা তো এমনই- আবেগ নিয়ে খেলতে খেলতে,

তবুও দেখো, কত্তোগুলো বই হল !!

লেখিকার নিজের কথা

এই কাহিনী পুরোটাই মনগড়া । আমার কল্পনা । কিন্তু

যেই বাড়িটির কথা শুনে ও পড়ে আমি এই গল্প ফেঁদেছি, তা পরবাসের এক অতি পুরনো বাড়ি । সেখানে নাকি সত্যি সত্যি ভৌতিক কান্ড হয় ; বাড়ির মৃত লোকজন এখনো নিয়মিত ওখানে হানা দেয় আর অনুষ্ঠান বা পার্টি চলার সময়, জীবিতদের জিনিসপত্র গায়েব হয়ে যায় । পরে অন্যত্র পাওয়া যায় । অনেকে কটেজে প্রবেশ করে নাকি মালকিনকে শাসায় :: আমার জিনিস এক্ষুনি ফেরৎ দাও, কেন নিয়েছো ? প্লিজ !_**তারপর নাকি সেগুলি পাওয়া যায় ।** অনেকের বিয়ের আংটি এইভাবে হারিয়েছে ও পরে পেয়েছে । দুষ্টু ভূত । তবে কারো ক্ষতি করেনা । আমি নিজে ওখানে আজও ফিজিক্যালি যাইনি, মনে মনে যাই । ইচ্ছে আছে ঘুরে আসার । **সাহসীরা অবশ্যই ঘুরে আসতে পারেন ।** আমি কিন্তু ওখানে গেলে নিজের

গল্পের চরিত্রদেরই খুঁজবো --শেফালি, জলি , মেহের ইত্যাদি । ছায়ামানুষ হলেও ; আমার কাছে ওরা জীবন্ত ; ভূত নয়।

আর ঠিক এরকমই, আরো অনেক বাড়ি আছে কিন্তু সেসব জায়গা প্রেতমুখের লালা নিঃসরণ থেকে বঞ্চিত । সবাই তো জানেই- ব্রহ্মান্ড ক্রুর ও নিষ্ঠুর ! কাজেই কেন এরাই বা বঞ্চিত তা জানে একমাত্র প্রকৃতি,যার কাজ আমাদের নিজ লীলায়, তান্ডব নাচানো--।

THE END